হায় চাঁদ!

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

তাঁর জীবনের শেষ দিনটায় মুম্বাইয়ের হাসপাতালের আই সি ইউ-তে বড় অস্থির ছিলেন সিতার নওয়াজ উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান। বিড়বিড় করে কেবল কলকাতায় ফেরার কথা বলছিলেন, আর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বিছানার চাদরে কী একটা আঁকিবুকি কাটছিলেন। ডা: শেঠনা ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে আশ্বস্ত করেছিলেন, খাঁ সাহাব, আপ জরুর কলকাত্তা লওটেঙ্গে। বিলকুল শাহেনশা জ্যায়সা, অউর ঢের সারে গান-বাজানা ভি করেঙ্গে।

ইবাদত খান তখন ফ্যালফ্যাল করে উপরে ধবধবে সাদা সিলিঙের দিকে চেয়ে, আর সেই চোখে তখন দু-ফোঁটা জলও কি ছিল না? বেডের পাশ থেকে সরে আসতে আসতে ডা. শেঠনা নার্স মেরি জনকে বলেছিলেন, আই ডোন্ট নো হোয়াই খান সাহাব ইজ ভেরি স্যাড টুডে। মেরি জন লক্ষ করেছিলেন খাঁ সাহেবের ডান হাতের তর্জনীর কাঁপুনি। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ডা. শেঠনার উদ্দেশ্যে বললেন, ইজন্ট হি ট্রাইং টু রাইট সামথিং, ডক্টর?

ডা. শেঠনা মাথা ঘুরিয়ে দৃশ্যটা দেখে বললেন, অর ইজ হি ট্রাইং টু প্লে সামথিং? দ্যাটস হিজ সিতার ফিঙ্গার, ইজন্ট ইট?

ইবাদত খাঁর চোখ বুজে এসেছিল ততক্ষণে, বন্ধ চোখের পাতা চুইয়ে দু-ফোঁটা জল বেরিয়ে এসে চোখের দু-পাশে গড়াল। ডাক্তার চলে যেতে মেরি জন শিল্পীর মাথার কাছে মুখ নিয়ে কোমল করে বললেন, সাহেব, কিছু বলবেন?

ইবাদত খাঁ চোখ বোজা অবস্থায় বিড়বিড় করলেন কিছু, কিন্তু সে-কথায় ধ্বনি নেই। মেরি জনের চোখ ফের চলে গিয়েছিল শিল্পীর ডান হাতের আঙুলটার দিকে। ফের কী একটা লিখছে যেন ওই তর্জনী। মেরি জন নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, কলম দেব? কিন্তু খাঁ সাহেব কি তা শুনতে পেলেন?

মেরি জন তখন একটা হালকা কলম এনে শিল্পীর হাতে দিলেন আর তার নিবের নীচে একটা ছোট্ট প্যাড ধরে বসলেন।

এতক্ষণের সচল তর্জনী এবার স্থির হয়ে গেল। মেরি জন দেখলেন খাঁ সাহেবের ঠোঁট নাড়াও বন্ধ।

সেদিন মধ্যরাতে উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান দুনিয়ার সব মায়া কাটিয়ে জন্নতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু দম তোড়ার আগে একটাই কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন—

কলকাত্তা যানা হ্যায়। আর মেরি জনের হাতে ধরা প্যাডে প্রায় হিজিবিজি করে আঁকতে পেরেছিলেন একটাই শব্দ উর্দুতে—জন্নত।

প্লেনে করে ওঁর মরদেহ কলকাতায় আনতে আনতে চর্চা চালু হয়েছিল খাঁ সাহেব কলকাতাকেই কেন জন্নত মেনেছিলেন। ওঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী মির বখশ সাহেব বললেন, আরে বলবে না-ই বা কেন? এই কলকাতাতেই কি গোর হয়নি ওর আব্বা মরহুম উস্তাদ ইজাজত হুসেন খাঁ সাহেবের!

উস্তাদের নামটা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কানে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালেন মির বখশ।

মির বখশের পাশের সিটে ছিলেন ইবাদত খাঁর নামজাদা হিন্দু শিষ্য, মুম্বাইয়ের ব্যাবসাদার অরুণ পোপট। তিনি বললেন, পরন্তু মি সাহাব, উস্তাদজি কিন্তু তালিম দিতে দিতে কখনো কখনো বলেছেন, 'জন্নত হ্যায় কি নহি মুঝে পতা নহি। মগর সিতার বজাতে হুয়ে জিন্দেগির্মে কই দফে এহসাস হুয়া কে ম্যাঁয় জন্নতমে হু। ওঁর জন্নত, মির সাব, কলকাতায় বললে সেতারকে একটু হেলাফেলাই করা হবে।

মির বখশ এমনিতেই কম কথার মানুষ, তিনি আর কথা বাড়াননি।

কিন্তু খাঁ সাহেবের দেহ দমদম থেকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে ওঁর শেষ হস্তাক্ষরটি কোথায় যে তলিয়ে গেল, কেউ আর তা মনে করতে পারল না। তাঁর দুই বিবি ও তাঁদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একটা অনুষ্ঠার দ্বন্দ্বই শুরু হয়ে গিয়েছিল বডি কোন বাড়িতে প্রথম যাবে তা নিয়ে, কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তেও ডান হাতের মুঠোয় ধরা চিরকুটটা নিয়ে কারোই কোনো তাপ-উত্তাপ নজরে পড়ল না।

তবে চিরকুটের ওই 'জন্নত' শব্দটা নিয়ে চর্চার ইতি হল না। খবরের কাগজের প্রতিবেদনেও কথাটার উল্লেখ হল। প্লেনে বসে মির বখশ ও অরুণ পোপটের দু-দুটো ব্যাখ্যাও রসিয়ে লেখা হল কোনো এক পত্রে। রবীন্দ্র সদনে ফুলমালায় ঢাকা খাঁ সাহেবের শবের পাশ দিয়ে একে একে হেঁটে যাচ্ছেন মন্ত্রী আমলা লেখক শিল্পী সংগীতজ্ঞরা যখন, দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে সুমন্ত তখন মনের চোখে বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটা দেখছিল। খাঁ সাহেব অদ্ভুত এক ছন্দে একটু একটু করে ছিড়ছেন ওর লেখা খাঁ সাহেবের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের

পান্ডুলিপিটা। আর আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন, আমি ইতিহাসে থাকতে চাই, সুমন্তবাবু, নিউজপেপারের হেডলাইনে নয়।

সস্নেহে 'বাবু' করে ডাকার আদত ছিল খাঁ সাহেবের, অথচ ওই স্নেহের ভাষাতেই জগতের সবচেয়ে কঠিন কথাটাও বলে ফেলতে পারতেন। সেই সন্ধ্যায় যেমন পান্ডুলিপিটা ছিড়তে ছিড়তে বললেন, এত কিছু বললাম তোমাকে আমার সিতার আর জিন্দেগি নিয়ে, তবু তোমাকে লিখতেই হল আমার পেয়ার-মোহব্বত নিয়ে? কিছু নারীর সঙ্গে কতটুকু কী ঘটল তাকেই প্রেম আর ভালোবাসা বলছ, আর সেতারের প্রতি সারা জিন্দেগির এই রিয়াজত, ডিভোশন, তার কোনো দাম নেই?

সুমন্ত তখন খুব নীচু গলায়, কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছিল, কিন্তু সেতার ধরেও আপনি প্রেম আর ভালোবাসাই খুঁজেছেন চিরকাল ...আপনি নিজেই বলেছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে খাঁ সাহেবের মুখ বেশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, নীলচে কালো আকাশ আর নদীর পশ্চাদপটে একটা সিলুয়েটের মতো ধরা দিচ্ছিল মুখটা। প্রশ্ন শুনে ওঁর মুখের কী ভাব হল সুমন্ত দেখতে পেল না, কিন্তু মুখের সরল জবাবটা শুনে বেবাক অবাক হয়ে গেল। খাঁ সাহেব বললেন, হ্যাঁ, প্রেম তো আমি খুঁজেছি, সারাক্ষণ খুঁজেছি...কিন্তু পেয়েছি কি? পেলে, এই দু-হাতে জড়িয়ে রেখে দিতাম বরাবরের মতন, যেমন করে ধরে রেখেছি সিতারকে। সুমন্ত চুপ করে ছিল, মাথার মধ্যে খেলাচ্ছিল কী করে এইমাত্র টুকরো টুকরো হওয়া সাক্ষাৎকারটাকে নতুন করে লিখবে। লিখলে তাতে এইমাত্র শোনা কথাগুলোও কীভাবে কোথায় জুড়বে। ওকে চুপ দেখে কিংবা নিজের কথাতেই একটু অবাক হয়ে খাঁ সাহেবও চুপ করে গিয়েছিলেন। দু-জনের মধ্যে একটা মাছির ভনভনানি ছাড়া কোনো শব্দ ছিল না। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে খাঁ সাহেব বলে

উঠেছিলেন, পেয়ার হয়নি এত বদনসিব আমি নই, সুমন্তবাবু। কিন্তু পেয়ার হওয়া মানেই কি পেয়ার পাওয়া?

জীবনে তো অনেক কিছুই আসে, হয়, ঘটে, কিন্তু তার মানেই কি তা পাওয়া যায়? জীবনে কম তো সিতার বাজাইনি, তা বলে কি ভৈরবের ঋষভটা একবারও আব্বা ইজাজাত খাঁ সাহেবের মতো টানতে পেরেছি?

সুমন্ত ইবাদত খানের প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা না করে বলেছিল, কিন্তু আপনার তিলক কামোদ রেণ্ডারিং পৃথিবীকে আপনার প্রেমের কথাই শোনায়। প্রেমে না পড়লে তিলক কামোদের ওই চেহারা কি আসে, খাঁ সাহেব? আই মিন নারী-পুরুষের প্রেম।

সরলভাবে হেসে খাঁ সাহেব বলেছিলেন, আসে না বুঝি? সুমন্ত কথার জবাব দিচ্ছে না দেখে ফের বলেছিলেন, তুমি ঠিকই ভেবেছ—আসে না। চাঁদ না দেখলে চাঁদের বর্ণনা দেওয়া যায় না। তবে চাঁদ দেখা গেলেই কি চাঁদকে পাওয়া হয়, বাবু?

প্রেম তা হলে এতই দূর?—জিজ্ঞেস না করে পারেনি সুমন্ত।

খাঁ সাহেব তখন স্বগতোক্তির মতোই বলেছিলেন, সবই নির্ভর করে জীবনের এত নারী, এত সম্পর্কের মধ্যে ঠিক কোনটিকে তুমি সেই একটা প্রেম, একটা চাঁদ, সেই ভৈরবের ঋষভ বলে ধরতে চেয়েছ, কিন্তু পারেনি। একটা স্বর্গ ... একটা জন্নতও বলতে পারে, যার খবর তোমার আছে, কিন্তু তুমি গিয়ে পৌঁছাতে পারলে না।

ইবাদত হুসেন খান এরপর নীচু হয়ে মাটির থেকে কাগজের টুকরোগুলো যত্ন করে কুড়িয়ে পাশের ছোট্ট টেবিলে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, এই যে সব নারীর কথা লিখেছ, এদের সবার কথা আমিই বলেছি...ঠিক কথা। কিন্তু বলতে যে পারলাম তা তো ওই জন্যই কি এরা সব একেকটা ঘটনা আমার জীবনে। কিন্তু এই সব কহানির মধ্যে ওই যে একটা প্রেম কোথায় হারিয়ে গেল তা কি আর তুমি জানতে পারলে? না তোমার রিডার কোনোদিন জানতে পারবে? তোমরা আমার তিলক কামোদের রোমান্টিসিজমটাই দেখতে পাও, তার পিছনের দর্দ-এ-দিল, বুকের রক্ত দেখতে পাও? তোমার এই ইনটারভিউয়ে আমার মুহববত বলে অনেক মিঠি বাত, মিঠি বোলি, মিঠা দর্দের কথা লিখেছ, পড়তে বেশ মজাও আসছে...বাট ইজ দ্যাট মাই লাভ? যা কিনা আমি পঞ্চাশ বছর ধরে এই ভাঙা বুকটায় এই এইরকম করে লুকিয়ে আসছি?

ইবাদত খাঁ এমন করে দু-হাতে বুকটাকে আগলে ধরলেন যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে বুকে নিয়েছেন। সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, এই পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যথাটা বুকে ধরে রেখেছেন কোনোদিন কাউকে বলবেন না বলেই কি?

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছিল, নদীর পাশের বাড়ির ছাদে আরামকেদারায় বসা খাঁ সাহেবকে এক রাশ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—বলব কী করে বাবুসাহেব? বাজনাতেই পুরো ঢালতে পারি না। একটা সিগারেট ধরিয়ে কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ইবাদত খাঁ, একটা লম্বা টান দিলেন সিগারেটে, তারপর আস্তে করে হেঁটে গিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সেই চাঁদ, সেই প্রেম নিয়ে বলতে গেলে রাধার দশা হবে। যাকে সখীরা প্রশ্ন করছে, হ্যাঁ রে, তোর কৃষ্ণকে দেখতে কেমন? আর সে বলছে, কী করে বলি বল? যে জুবান বলবে তার তো আঁখ নেই, আর যে আঁখ দেখে তার তো জুবান নেই।

খাঁ সাহেব হাসছিলেন, কিন্তু অন্ধকারে ওই হালকা হাসিটাও বড়ো করুণ শোনাচ্ছিল সুমন্তর কাছে। হাসি মিলিয়ে যেতে কাঁপা কাঁপা গলায় সুমন্ত বলেছিল—আমি খুব সাধারণ একজন সাংবাদিক, খাঁ সাহেব। আপনি কি চাইবেন না আপনার এই লুকোনো, না বলা প্রেমের কাহিনি লিখে একটু সমাদর পাই মানুষের? একটু নজর...?

ফের এক রাশ নৈঃশব্দ্য নেমেছিল নদীর পাড়ের খোলা ছাদে। একটা ঝিরঝির বাতাসও উড়ে এসেছিল কোত্থেকে। ঘন কালোর মধ্যে টেবিলে রাখা ছেঁড়া পান্ডুলিপির সাদা কাগজগুলো একটু বেশি রকম সাদা ঠেকছিল, রাতের সমুদ্রতটে ঢেউয়ের সাদা ফেনার মতো। সুমন্তর গলায় একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল চাপা কান্নার। ওর মনে হল, খাঁ সাহেবকে একটা প্রণাম করে বাড়ি ফিরে যায়। বোধ হয় উঠতেই যাচ্ছিল সুমন্ত, হঠাৎ পিঠে ভারী দুটো হাত ইবাদত হুসেন খাঁর, আর স্নেহ ঝরে পড়া গলায় আদেশ-বোসো!

সুমন্ত তো তখনও বসে, পিছন ফিরে উপরে চেয়ে বলল, কিছু বলবেন, সাহেব?

খাঁ সাহেবের কন্ঠ ভেসে এল, কত অবধি রাত জাগতে পারো, বাবু? কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সুমন্ত বলল, কেন, সাহেব?

খাঁ সাহেবের কথা ভেসে এল ফের, কেন, আমার প্রেমকহানি শুনবে যে!

সুমন্ত বলল, তা হলে সারা রাত!

‘তাহলে এসো’ বলে ইবাদত হুসেন খাঁ ওর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন বাড়ির সদর দরজায়, বাবুর্চি হানিফকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। সে ‘জি হুজুর! জি হুজুর’! করে দৌড়ে আসতে বললেন, দশ বাজে করিব খানা লগানা সাহাবকে লিয়ে। মেরে লিয়ে বস এক স্যুপ। হম অব বৈঠেঙ্গে নদী কে

কিনারে...প্রমাদ গুনেছিল হানিফ। বাইপাস হওয়া অসুস্থ শরীরে নদীর পাড়ে খাঁ সাহেব? সে শিউরে উঠে বলল, সাব, ইস ওয়ক্ত! খাঁ সাহেব শুধু গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, হানিফ! হানিফ চুপ মেরে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ, খাঁ সাহেব গায়ের হালকা চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে বলেছিলেন, এরা জানেই না আমি কবেই মরে গেছি, এরা সি একটা লাশকে পাহারা দিচ্ছে। খাঁ সাহেবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুমন্ত অনুযোগ করেছিল, কেন এমন অলক্ষুণে কথা বলেন, সাহেব?

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ইবাদত হুসেন খাঁ বলেছিলেন, বাবুসাহেব, যতবার আমি দরবারি ধরি ততবারই আমি মরি...তুমি জানো না?

তারপরই ওঁর ওই দিলখোলা 'হাঃ হাঃ হাসিতে কেঁপে উঠেছিল নদীর পাড়।

রবীন্দ্র সদনের ফয়ারে নরম করে বাজছিল খাঁ সাহেবের সেই সব দরবারির কোনো একটা। মানুষের ঢল নেমেছে সদনের চত্বরে, অদূরে আঁচলে চোখের জল মুছছে দু-টি বাঙালি মেয়ে, এক বৃদ্ধ মোল্লা আকাশের দিকে চেয়ে কীসব বলে যাচ্ছেন আপন মনে, আর সুমন্তর শুধু মনে পড়ছে নদীর পাড়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসা খাঁ সাহেবকে।

তুমি জানো, বাবুসাহেব, আমি আম্মা অঞ্জুমান আরা সাহেবানের আদেশে গান গাওয়া ছেড়েছিলাম!—এক সুদূর কণ্ঠে বললেন ইবাদত হুসেন খান। উনি কোনো জবাব চাইছিলেন কিনা না বুঝতে পেরে সুমন্ত বলেছিল, তাই তো শুনেছি।

ঝাঁ করে শিল্পী বললেন, কোথায় শুনেছ? আমতা আমতা করে সুমন্ত বলল, হয়তো পড়েছি কোথাও।

অল রাবিশ! যত নিউজপেপার ফিকশন। নাও ইউ হিয়ার ফ্রম মি... বাট!

বাট?

আমার কহানি কোনো ইন্টারভিউ করে লিখবে না।

বুঝলাম না জনাব।

ইবাদত হুসেন খান হাতের সিগারেটটা নদীর জলে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, রাইট ইট লাইক স্টোরি, লাইক হিস্ট্রি, যেমন কিনা 'সাউণ্ড অব মিউজিক' সিনেমা, যেখানে হাসি থাকবে, কান্না থাকবে, গানও থাকবে, অ্যাণ্ড ইট উইল অলসো বি আ ভেরি টু স্টোরি অব লাইফ। শুধু একটা নাম তুমি সেখানে ইউজ করতে পারবে না...কার নাম, সাহেব?–জিজ্ঞেস করে বসেছিল সুমন্ত।

খাঁ সাহেব বললেন, তার নাম, যাকে নিয়ে কহানি।

প্রমাদ গুনল সুমন্ত, সে কী! যাকে নিয়ে গল্প তারই নাম করা যাবে না! দেন হাউ উইল ইট বি টু?

ইবাদত খাঁ আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বিকজ আই অ্যাম টেলিং দ্য স্টোরি। আর নামে কী এসে যায়? করে দাও লায়লা কি মুমতাজ কি রিজিয়া...

সুমন্ত বলল, তা হলে আপনার জীবনের সেই একটাই চাঁদ মেঘেই ঢাকা থেকে যাবে!

ইবাদত খাঁ বললেন, না, থাকবে না। দুনিয়ার যেখানেই আমার ইন্তেকাল হোক, সেই নাম তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর জানো তো বাবু, আমার সময় বেশি নেই। একেক দিন শুতে গেলে মনে হয় সব তো পাব না। কে জানে কালকের সকালও দেখতে পাব কি না!

খাঁ সাহেবের কথায় শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল সুমন্তর। খাঁ সাহেব বললেন—তোমার কহানিতে আমার সেই পুনমকে চাঁদের নাম যা খুশি রাখো, কিন্তু দেখো ওর গায়ে যেন কলঙ্ক না লাগে।

সুমন্ত বলল, কলঙ্ক তো চাঁদেরই হয়, জনাব। যাতে আরও সুন্দর হয় চাঁদ।

এবার উপরে আকাশের দিকে চোখ মেলে সরু একফালি বিবর্ণ চাঁদ দেখতে দেখতে ইবাদত খাঁ বললেন, জানি। আর এও কি জানি না, ইতিহাস লেখা হলেও ইতিহাস থেকে যায়? আর তা মানুষ জেনেও যায়। যে-জন্যই কিনা হিন্দোস্তানের এক সেরা শায়ের লিখেছিলেন সেই কত কত বছর আগে

পত্তা পত্তা বুটা বুটা
হাল হমারা জানে হ্যায়।
জানে ন জানে গুলহি ন জানে
বাগ তো সারা জানে হ্যায়।

বুঝলে কিছু? কবি বলছেন, পাতায় পাতায়, কুঁড়িতে কুঁড়িতে আমার অবস্থা জানাজানি হয়ে গেছে। ফুল জানুক বা না জানুক, বাগিচা সব জানে।

তারপর কী একটা সুর ভাঁজতে শুরু করেছিলেন খাঁ সাহেব, আর তারই মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নাও, চলো। আমার বলতে ইচ্ছে করছে...।

তারপর আর সেই রাতের কিছু মনে নেই সুমন্তর। কিছু লেখেনি, কিছু টেপে রেকর্ড করেনি, শুধু শুনেছে...কখন চাঁদ আর সঙ্গী তারারা মিলিয়ে গেছে ভোরের আলোয় জানতেও পারেনি। কথা শেষ করে কখন উস্তাদ ওরই কোলে কাশতে কাশতে ঘুমিয়ে পড়েছেন...বেচারি হানিফ এসে ভয়ে ভয়ে ডেকেছে, সাব! খাঁ সাব! সুবহ হো রহা, ম্যাঁয় চায় লাউ?

সেদিন সন্ধ্যায় খাঁ সাহেবকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে এল সবাই। তার তিন দিন পর নিয়ে যাওয়া হল মুম্বাইয়ের যশলোক হসপিটালে। বলা হল ফুসফুঁসে ক্যান্সার। এও শোনা গেল সময় মতো ধরা পড়ায় পরমায়ু হয়তো বছর খানেক বাড়ল। তারপর দু-মাস না যেতেই ...

খাঁ সাহেবের বডি ফের কাঁধে তুলেছে সবাই, এবার যাত্রা শুরু কবরের দিকে। হাতের পান্ডুলিপিটা বুকের কাছে ধরে স্থির হয়ে সেই এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুমন্ত সকাল থেকে। খবরের কাগজে জন্নত শব্দটা নিয়ে চর্চার কথা পড়ে গল্পের সাবখান থেকে জরিনা নামটা কেটে কেটে জন্নত করেছে। কারণ? ওর মন বলছে শেষ চিরকুটে নামটা লিখেছিলেন খাঁ সাহেব মেঘ সরিয়ে বুকের চাঁদটাকে একবার বারে আনতে। শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটাকেও মুক্তি দিয়েছিলেন...

২.

হাই কমিশনার কৃষ্ণ মেনন সাহেব ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, দেশে ফেরার জাহাজ টিকিট চাইতে এলে তো, ইবাদত? ওটা এখন পাবে না। কিপ প্লেইং অ্যাণ্ড এনজয় ইংল্যাণ্ড।

সুদর্শন তরুণ সেতারি উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান হাই কমিশনারের মস্ত টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে আস্তে করে বসতে বসতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কিন্তু আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে, স্যর।

এবার চোখ তুললেন কৃষ্ণ মেনন—হোয়াই?

আবার গলা ধরে যেতে বসল ইবাদতের, আজ্ঞে, মন খারাপের কি কোনো 'কেন' আছে স্যর?

কৃষ্ণ মেনন বেল প্রেস করে দু-কাপ চা আর কিছু বিস্কুট অর্ডার করলেন। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লেন—আই ডোন্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ আর্টিস্টস! টাকা, যশ, আরাম, ফুর্তি সব পাচ্ছ এখানে, আর তার পরেও ইউ স্টিল ওয়ান্ট টু গো হোম। কী আছে দেশে বলো তো আমায়।

ইবাদত মিন মিন করে বলল, আসলে মনটা তো মনই। কিছু বোঝে না স্যর।

চা আসতে কৃষ্ণ মেনন চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতে খেতে বললেন, তাহলে মনটাকে এত পাত্তা দাও কেন? লুক হাউ হ্যাণ্ডসাম ইউ হ্যাভ বিকাম ইন জাস্ট সিক্স মানথস! সাহেবদের মাথা খারাপ করে দিয়েছ এই ক-দিনে। সবাই বলছে ইউ আর দ্য বেস্ট ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট আফটার ইণ্ডিপেন্সে। বেহালার লেজেণ্ড ইয়াশকা হাইফেজ, হিরোইন ইনগ্রিড বার্গম্যান, জিন সিমনস, হিরো ওয়াল্টর পিজন ...এঁদের সঙ্গে তুমি প্রোগ্রামে নামছ, ফেস্টিভাল অব ব্রিটেনের ইউ আর আ স্টার। অ্যাণ্ড ইউ ওয়ন্ট টু গো ব্যাক হোম। আমি বুঝতেই পারি না কেন।

ওঁর কথার তোড়ে ইবাদত ওর কাপে চুমুক দিতে পারছে না দেখে একটু থামলেন কৃষ্ণ মেনন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, হয়তো এই জন্যই তোমরা আর্টিস্ট। আর আমরা ...

সাহেবের কথা ঠিক শুনতে না পেয়ে ইবাদত বিব্রতভাবে বলল, আজ্ঞে, আমায় কিছু বললেন, স্যর?

কৃষ্ণ মেনন বললেন, হুম! বলার আর কী আছে? শুধু জানার ইচ্ছে একটাই—তুমি কেন চলে যেতে চাইছ? গিভ মি ইন ওয়ান সিম্পল সেনটেন্স। আমি ওই সব মন-ফন বুঝি না, আই অ্যাম নট অ্যান আর্টিস্ট।

ইবাদতের চোখের সামনে তখন ভাসছে জাহাজঘাটায় ওকে সি-অফ করতে এসে মস্ত জাহাজটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা জন্নতের চোখ দুটো। নদীর জল জলের মতো নীল চোখেও তখন দু-ফোঁটা জল। তার একটু আগেই জিজ্ঞেস করেছিল—আমার সিনেমায় নামায় তোমার এত ভয় কেন, ইবা? ওটা খারাপ লাইন? সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকার ঠোঁটটা ওর ডান হাতে চেপে ধরে বলেছিল ইবাদত, না, না, তা কেন? তা কেন? ওভাবে তো ভাবিই না কখনো।

তাহলে?—তখন অভিমান জন্নতের গলায়।

ইবাদত বলেছিল, শুধু তোমাকে হারাবার ভয়।

জন্নতের সব অভিমান ফের ভর করেছিল গলায়, সেজন্যই জাহাজে করে বিলায়েত পাড়ি দিচ্ছ তো জনাব?

ইবাদতের চটকা ভেঙেছিল কৃষ্ণ মেননের কেতাদুরস্ত অর্ডারের ভঙ্গিতে—আমাকে স্রেফ একটা বাক্যে তোমার কারণ বলো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

ইবাদত আকাশ-পাতাল বহুত কিছু ভেবে শেষে একটা ছোট্ট বাক্য উগরে দিল—আই অ্যাম ইন লাভ, স্যর।

চব্বিশ দিন ধরে জাহাজে এই একটাই বাক্য আবৃত্তি করতে করতে এসেছে ইবাদত। আই অ্যাম ইন লাভ ... আই অ্যাম ইন লাভ ... আই অ্যাম ইন লাভ ... সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে বয়ে যেতে যেতে ডেকে দাঁড়িয়ে বাক্যটা আবৃত্তি করছিল ইবাদত, হঠাৎ মনে হল ওর, এটা খুব সহজ কথা নয়। কোথায় একটা পাওয়ার এবং অথরিটির ছাপ আছে। যেন শেরের মতলা, কবিতার প্রথম কলি। বোম্বাইয়ে বাড়ি ফিরে ইবাদত প্রথম ফোনটা করেছিল জন্নতকে। সাত মাসে আরও সুন্দর হয়েছে ওর কণ্ঠস্বর—হ্যালো।

কোনো ভণিতা নেই, নখরা নেই, কেমন আছ?' 'কী করছ?'-র বালাই নেই, ইবাদত এতকাল ধরে মকশো করার পরও প্রায় আনাড়ির মতো কাঁপুনি ধরা গলায় বলল, আই অ্যাম ইন লাভ। তারপর সেনটেন্স কমপ্লিট করার জন্য জুড়ল—উইথ ইউ! কিন্তু ওপার থেকে কোনো স্বর ভেসে এল না। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার আওয়াজ।

ইবাদত ফের বলল, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙল না।

ইবাদত আবার বলল, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ, জন্নত। এবার ফোনটা রেখে দেওয়ার আওয়াজ হল।

সেই সন্ধ্যায় বাড়ির বার হল না তরুণ উস্তাদ, গোটা বোম্বাই শহরটাকে যেন কবরের ঠাণ্ডায় ধরেছে। ও সেতারের রেওয়াজেও বসল না। বহুদিন পর দম দেওয়া গ্রামোফোনটা নামিয়ে ঝাড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বিলেত থেকে আনা নতুন পিন লাগিয়ে তাতে একটা রেকর্ড চাপাল। নিজের রেকর্ড? না আব্বাজানের? না। প্রিয় গাওয়াইয়া বড়ে গুলাম সাহাবের? না। প্রিয় আমির খাঁ সাহাবের? তাও না। দু-বছর হল বেগম আখতার সাহেবান ওকে ওঁর এই রেকর্ডটা উপহার দিয়ে বলেছিলেন, আনন্দের সময় শোনার মতো অনেক কিছুই আছে তোমার। এটা রাখো কোনো দুঃখের রাতের জন্য, ইবাদত।

এমনিতেই দুঃখে ডুবে থাকা স্বভাব ইবাদতের, নতুন করে বেদনা জাগানোয় বড়ো ভয়। আজকের মনের ব্যথায় সেই ভয়টাও যেন উবে গেছে। ও চোখ মুছতে মুছতে টার্নটেবলে রেকর্ড চাপিয়ে দিল। দাগ-এর শের নিয়ে বেগম আখতারের গজল

উজর আনে মেঁ ভি হ্যায়
অউর বুলাতে ভি নেহিঁ।
ওয়ায়েসে তারিকে
মুলাকাত বতাতে ভি নেহিঁ।
খুব পরদা হ্যায় কে
চিলমন সে লাগে বৈঠে
সাফ ছুপতে ভি নেহিঁ
সামনে আতে ভি নেহিঁ।

বেগম একটা একটা করে সুর লাগান আর ইবাদত ‘হায়! হায়!’ করে কপালে একটা চাপড় মেরে বলে—আরে, এই তো তিলক কামোদে লাওনর শকল। এই তো সেই ব্যথার মুখ, বুকের ধড়কন।

তারপর আস্তে আস্তে সুর ভুলে কথার চক্করে পড়ে ইবাদত। ৭৮-অর পি এম পুরো ঘুরে যেতে ফের নতুন করে চালায়। বিশ-বাইশ বারের পর নিজের সঙ্গে কথা শুরু হয় ইবাদতের—সালাম দাগ দেহলভি সাহাব! তুমি কোথায় পেয়েছিলে আমাকে অতকাল আগে? এত দুঃখ তো শুধু আমারই আছে সাহেব, তুমি কোথায় পেলে সেসব?

কী সুন্দর বলছ তুমি দাগ, যেন আমিই বলছি। চিয়ার্স টু ইউ, মাস্টার! বলে এবার গেলাসের স্কচটা শূন্যে তুলে ধরল ইবাদত।

তারপর জানলার বাইরের অন্ধকার আরব সাগরের দিকে চোখ মেলে বলল, ঠিকই ধরেছ, দাগ। না আসার হরেক ওজর দেখায় সে, অথচ আমাকেও ডাকে না। বলে না কবে দেখা হবে, তাও। এমন করে সে নিজেকে ঢেকে রাখে চিকের আড়ালে, যে দেখাই পাই না। পুরো লুকোয় না, আবার স্পষ্ট করে ধরাও দেয় না। সত্তর বার রেকর্ডটা বাজিয়ে আর দুটো করে বরফ দিয়ে এগারো পেগ হুইস্কি খেয়ে ইবাদত বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ঘরে। দরজায় টোকা মেরে সাতবার ফিরে গিয়েছিলেন আম্মা অঞ্জুমান বেগম। ছেলে ‘আসুন!’ না বললে দরজা ঠেলে ডোকা আদত নয় ওঁর। কিন্তু ভোর রাতে আর না এসে পারেননি।

আর ঢুকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়েছিলেন—হায়, আল্লা! ইয়ে তো বিমার পড়ি! বাকি দিনটাও ঘুমে কাদা হয়েছিল ইবাদত, দুপুরের খাওয়াও বরবাদ হল। সন্ধ্যে সাতটায় ঘুম ঝেড়ে উঠে প্রথম কাজটা হল জন্নতের বাড়ির নম্বর চাওয়া। ফের সেই নায়িকা কণ্ঠে ‘হ্যালো?’ ইবাদত খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কেমন আছ?

একটা আড়ষ্ট উত্তর এল, ভালো।

ইবাদত বলল, আমার শেষ চারটে চিঠির জবাব পাইনি।

জন্নতের কোনো জবাব নেই।

ফলে ইবাদতই ফের বলল, তোমাকে সারাক্ষণ মিস করেছি।

জন্নতের প্রায় ঠাট্টার সুর-অ!

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

এত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী আছে?

তোমার-আমার যা মরাসিম, রিশতা, তাতে বিশ্বাসের কথা আসবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সম্পর্ক তো আছেই। দূরে সরে থাকার সম্পর্ক।

ওহ! ওহ! ওহ! ইয়ে হি ন বাত? দূরে কি শখ করে চলে গিয়েছিলাম? মা আর মামা মিলে তো জোর করে, ছক কষে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে আমাদের টানটা কমে যায়।

—ভালোই তো করেছেন, যা হবার নয়, তাকে বেশিদূর গড়াতে দেননি। এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল ইবাদত, কী হবার নয়! যে সম্পর্কের স্রোত এতদূর গড়িয়ে এসেছে তাকে পিছনে ফেরাবে কে? এত অনুরাগের কথাটার বিশেষ দাগ বোধ হয় পড়ল না জন্নতের মনে। সে ফোন ছাড়ার তোড়জোড় করল—রাখছি। আমায় বেরোতে হবে।

ছাড়বে না ইবাদতও—কেন, কোথায় যাবে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল জন্নত—শুটিঙে।

আর ফোন রেখে দিল।

ইবাদত বিশ্বাস করতে পারছিল না, এ-ই সেই জন্নত যাকে বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় হাত নাড়তে দেখে আরব সাগরটাকে ওর কালাপানি মনে হচ্ছিল, যা পেরিয়ে ওপারে গেলে আর নাকি ফেরা হয় না। হঠাৎ হাঁটুর কাছটায় খুব দুর্বল ঠেকছিল ওর, কোনোমতে রেলিংটা চেপে ধরে নিজেকে সামলেছিল। আর রাতে কেবিনে চিঠি লিখতে বসে বাইরে সমুদ্রের ঢেউ দেখে একটা প্রিয় গজলের দুটো কলিই লিখে দিয়েছিল

দিলঁ মে এক লহর সি
উঠি হ্যায় অভি!
অউর তাজা হাওয়া
চলি হ্যায় অভি।।মনের মধ্যে ঢেউ আর বাতাসের কথার উত্তরে ওর মা মেহরুনের বহু পুরোনো একটা গজলের দুটো কথা লিখে দিয়েছিল জন্নতও—

আরজুয়েঁ হজার রখতে হ্যাঁয়।
তো ভি হম দিল কো মার রখতে হ্যাঁয়।।

আহা, কী জবাব! হাজারো বাসনা মনে, তবু মনকে রাখি বেঁধে। ইবাদত ধরতে পারেনি কার শের, তাই পরের চিঠিতে লিখল, প্রিয়তমা, তোমার মনের কথাটা কোন শায়েরকে দিয়ে বলালে, গোগা?

সেবার একটা গোটা কাগজে শুধু একটাই কথা লিখে পাঠিয়েছিল জন্নত-মীর!

সেই জন্নতই এখন ফোন রাখতে পারলে বাঁচে।

ইবাদত স্নান সেরে একটা হুইস্কি নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নীচের থেকে আম্মার ডাক এল—ফুরসত হোত নীচে উতরানা, বেটা!

বুকটা ধক করে উঠল উস্তাদের; এত গম্ভীর করে ডাকলে তো আম্মা অদ্ভুত আবদার জোড়েন। একবার শুনো মিঞা' বলে পাশে বসিয়ে গভীর রাতে বলেছিলেন, তুমি আমার ভাইসাবদের কাছে গান শিখছ, ভালো কথা। ঢের শিখেছ, এবার বন্ধ করো। তোমার বাপের ঘরের সম্পদ হচ্ছে সেতার, সেই সেতারেই ডুবে থাকো।

বুকটা ব্যথায় মুজড়োচ্ছিল ইবাদতের। করুণ চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন মা? এত ভালো গান আপনার বাপের বাড়ির, সেই গান গাওয়া কি দোষের? আম্মা বলেছিলেন, আর আমার স্বামীর ঘরে যে এত অতুলনীয় এক সিতার বাজ! ইবাদত বলল, কিন্তু আমি যে দুটোই চাই! আম্মা বললেন, তাহলে তুমি আব্বার চেয়ে বড়ো শিল্পী হবে কী করে?

কিন্তু আমি চাইলেই কি আব্বা জানের চেয়ে বড় সেতারি হতে পারি, মা?

তোমার আব্বা তো সেটাই চেয়েছিলেন, মিঞা। আর ওঁর ইন্তেকালের দিন আমাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন।

কী শপথ, মা?

যে, এমন করে গড়ব তোমাকে যে দুনিয়া একদিন সিতার বলতে ইবাদত বুঝবে, ইবাদত বলতে সিতার। সেদিন বহু রাত অবধি মা ও ছেলে পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিল। ঊষার প্রথম আলোয় পুত্র বলেছিল, মা, আমি গান ছেড়ে দিলাম। সেতার ছাড়া আর কিছু থাকবে না আমার।

ইবাদত এই সবই ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে দেখল টেবিলের উপর আব্বার একটা ফটোগ্রাফ রেখে পাশের কৌচে বসে আছেন আম্মা অঞ্জুমান আরা বেগম। ছেলে আসতে পাশের চেয়ারটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

ইবাদত বসতে মা বললেন, তোমার শরীরে খুব কষ্ট আছে, জানি।

ইবাদত চাপা গলায় বলল, মনেও।

মা বললেন, তাও জানি।

কিন্তু আপনি তো আমার ব্যথা বুঝছেন না। আমি সত্যিই জন্নতকে ভালোবাসি। আপনি ভেবেছিলেন আমাকে বিলাত পাঠিয়ে দিলে আমি ওকে ভুলে যাব।

কিন্তু ও তোমাকে ভুলতে পেরেছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ইবাদত—কেন এমনটা বলছেন আপনি, আম্মা? বহু কষ্ট চেপে রেখে ও দূরে সরে আছে। আমি শাদি করে ওকে ঘরে তুলে আনতে চাই।

একটা লম্বা সময় চুপ করে রইলেন অঞ্জুমান বেগম। শেষে বললেন, সেটা হবে না।

কীরকম নিষ্ঠুর শোনাল মার কথাটা। ইবাদত এবার একটু রাগত ভাবেই বলল, কেন, ও একজন বাইজির মেয়ে বলে?

অঞ্জুমান বেগম বললেন, কক্ষনো না। আমি একটা গানের ঘরের মেয়ে হয়ে এমনটা মনে করতেই পারি না। তা ছাড়া মেহরুনের মতো গাইয়ে ক-টা হয়েছে দুনিয়ায়?

ইবাদত বেশ অবাকই হয়েছিল আম্মার মুখে মেহরুন বাইয়ের এই প্রশংসায়। হয়তো এই প্রথমবার জীবনে মেহরুনের গানের এই প্রশংসা শুনল আম্মার মুখে। তাই সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কলকাতার বাড়িতে তো কোনো দিনও কোনো রেকর্ড দেখিনি মেহরুন বাইয়ের। তাহলে কোথায় শুনলেন ওনার গান আপনি? আম্মা বললেন, কেন, রেডিয়ো বলেও তো একটা জিনিস আছে। তোমার আব্বার সঙ্গে কম জলসাতেও তো যাইনি এককালে। ভুলে যেও না, মেহরুন একসময় ন-বছর কাটিয়েছে কলকাতায়, হর শাম মেহফিল বসিয়েছে ওর বাড়িতে, তোমার আব্বাও দিব্যি ভক্ত হয়েছিলেন ওঁর খেয়াল গজল ঠুংরির!

তাহলে আপনার এত আপত্তি কীসের, আম্মা?—প্রায় কাতরোক্তি করে উঠল ইবাদত।

যেহেতু তোমার অউরত হিসেবে আমি ওকে ভাবতেই পারি না—সোজা জবাব দিলেন অঞ্জুমান বেগম।

ইবাদতেরও মেজাজ চড়ছিল একটু একটু করে। বলল, তার মানে জন্নতকেই আপনার পছন্দ না?

বেগম বললেন, খুব পছন্দ। ও সিনেমায় নামা সত্ত্বেও। কিন্তু তোমার বিবি হিসেবে ওকে আমি পছন্দ করব না কোনোদিনই। কিন্তু কেন, আম্মা? এ তো বড়ি তাজ্জব কি বাত!—ফের এক কাতরোক্তি ইবাদতের কণ্ঠে।

বেগম গম্ভীর সুরে বললেন, হাঁ বহত তাজ্জব কি বাত। মগর কভি কভি তাজ্জব কি বাত

ভি মাননা, পড়তা, মিঞা।

ইবাদত বলল, তা কি আমি মানিনি আগে, আম্মা? আপনি বলেছেন, আমি গান ছেড়ে দিয়েছি। আপনি বলেছেন, আমি কালাপানি পার করেছি। আর এখন আপনি বলছেন, আমার ইশক, আমার পেয়ার, আমার চোখের আলো, মনের প্রদীপ জন্নতকেও ছেড়ে দিতে। এর চেয়ে ভালো ছিল আপনি আমাকে প্রাণপাখিটাকেই ছেড়ে দিতে বলতেন।

অঞ্জুমান বেগম চুপ করে ছিলেন, ইবাদত মাথা নীচু করে বসে রইল অনেকক্ষণ, শেষে দুঃখে ভরাডুবি হতে হতে একটা শের আউড়াতে লাগল :

জুর্মে উলফত পে হমেঁ লোগ
সজা দেতে হ্যাঁয়।
ক্যায়সে নাদান হ্যাঁয় শোলোঁ কো
হাওয়া দেতে হ্যাঁয়।

ভালোবাসার অপরাধে লোকে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে... বেশ বলেছেন সাহির সাব। দিন, দিন, দিন, যত পারেন শাস্তি দিন। আম্মা, দোষ তো আমার একটাই—আমি ভালোবেসেছি। তবে জেনে রাখুন মা, আপনার কথা তো আমি ফেলতে পারব না, জন্নতকে আমার ছাড়তেই হবে। কিন্তু অন্য কোনো মেয়েকেও আমি বিয়ে করব না, তাতে ইজাজত খাঁর সেতার বংশ লোপ পেয়ে যাবে।

ইবাদত উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ফের বেগম আখতারের রেকর্ডটা টার্নটেবলে চাপিয়ে একটা ড্রিংক নিয়ে বসল। যে খিদেটা কিছুক্ষণ আগে চাড়া দিয়ে উঠছিল ভেতরে হঠাৎ করে সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল। হাতে ড্রিংকের গেলাস ধরে আখতারী বাইয়ের গজলের মকতা শের, যেখানে কবি দাগের নাম আসছে, সেই কথাগুলো আসতেই হিজ মাস্টার্স ভয়েসের লেবেলের সেই কুকুরের মতো গ্রামোফোনের একদম পাশে গিয়ে পা মুড়ে বসল ইবাদত। রেকর্ড থেকে বেগম আখতার তখন গাইছেন :

জিসৎ সে তঙ্গ হো
অ্যায় দাগ তো জিতে কিঁউ হো
জান পেয়ারি ভি নেহিঁ
জান সে যাতে ভি নেহি।।

শুনতে শুনতে বিড়বিড় শুরু হল ইবাদতের—জীবনটা যখন এতই দুর্বিষহ তাহলে বেঁচে আছিস কেন কবি? প্রাণের প্রতি টান নেই অথচ মরণও হয় না তোর। রেকর্ডটা থামতে হুইস্কির গেলাসটা শেষ করে ফেলল ইবাদত। তারপর আরেকটা ঢালল, আর নিমেষে শেষ করে দিল। তার পর আবার। সেটা শেষ হতে জন্নতের নম্বর চাইল বোম্বাই টেলিফোন অপারেটরের কাছে—সেন্ট্রাল ফাইভ নাইন সিক্স সেভেন, প্লিজ।

লাইন লাগতে ওপার থেকে সেই নম্র গম্ভীর স্বর—হ্যালো?

ইবাদত জড়ানো গলায় বলল, ইবাদত বলছি।

ওপার থেকে খুবই সংযত স্বরে—বলো।

বলার কিছু নেই, তোমার আওয়াজ শুনব বলে...

শোনা হল তো... রাখলাম।

জন্নত ফোন নামিয়ে রেখেছিল।

জন্নত ফোন নামিয়ে রাখল। প্রথমে কিছুক্ষণ কথাটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না ইবাদত। কান থেকে রিসিভার নামাতেও পারছে না। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর রিসিভার আপনা থেকে হাত থেকে খসে পড়ে গেল কার্পেটে।

ইবাদত সেটা তুলে জায়গায় রাখলও না। বরং উঠে গিয়ে আলমারির ভেতরের লকার খুলে দীর্ঘদিনের সঙ্গী পিস্তলটা বার করল। তারপর নিজের কপালের দিকে সেটাকে তাক করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাচ্চা, বহুদিন এই মিঞাকে তুই বাঁচিয়েছিস দুশমনদের হাত থেকে। আজ ভালোবাসার লোকদের হাত থেকে বাঁচা!

ইবাদত পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিয়ে দড়াম করে কার্পেটে পড়ে গেল। টোটাহীন পিস্তলে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হয়েছিল শুধু। বড়ো আওয়াজটা হল জোয়ান মরদের দেহটা হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল যখন।

আওয়াজ শুনে নীচের থেকে দুড়দাড় করে ছুটে এসেছিল বাবুর্চি সেলিম। আর উস্তাদকে পড়ে থাকতে দেখে ওর শোর মচানোয় উপরে উঠে এসেছিলেন বেগম অঞ্জুমান। ছেলেকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে বুকে হাত চেপে একটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন অজুমান আরা। তারপরই সেলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, জিন্দা হ্যায় তো?

সেলিম মনিবকে মাটি থেকে তুলতে তুলতে মাথা নেড়ে বোঝাল, হ্যাঁ।

অঞ্জুমান আরা তখন ছুটে গিয়ে ছেলের আঙুলে ফাঁসা পিস্তলটা বার করে জানালার বাইরে ছুড়ে ফেললেন। তারপর ছেলের মাথাটা কোলে নিয়ে কার্পেটে বসলেন মিকেলাঞ্জেলোর পিয়েতা মূর্তির মতো। আর নীরবে চেয়ে রইলেন সেতারের নবীন যিশুর মুখটার দিকে।

অঞ্জুমান আরার মনে পড়ল মৃত্যুশয্যায় স্বামীর কথাগুলো—মিঞার দিকে নজর রেখো, অঞ্জু। ও হমসে ভি বহত, বহত বড়া নিকলেগা। ও হমারে ঘরানেকা তানসেন হ্যায়। উসকো সমহালকে রখনা, অঞ্জু।

বেগমের মনে পড়ল অভাবের সেই দিনগুলো। দুটো ফুলকা আর একটা সবজি খেয়ে রাতের রেওয়াজে বসে ঘুমে ঢলে পড়েছে ইবাদত। টেবিল ফ্যানের তার দিয়ে শক খাইয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন অঞ্জুমান। মা!' বলে চিৎকার করে উঠেছিল ছেলে। মা বললেন, বহত লায়েক বন গয়ে হো, না? সামনে পড়ে হুয়ে বন্দির্শে কৌন উঠায়গা? চলো, সিতার উঠাও!

অঞ্জুমানের মনে পড়ল সেইসব সন্ধ্যে আর রাত যখন পাঁচ বছরের ইবাদতকে কোলে নিয়ে লোরি শোনাচ্ছেন আর গায়ে শাল জড়িয়ে স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছেন মেহরুন বাইয়ের কোঠার দিকে। তখন বুকের ভেতরটা হু হু করছে ব্যথায়, আর তারই মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বর্গের শান্তি। মনে মনে শুধু আওড়াচ্ছেন, আমার আশিককে তুমি কেড়ে নিয়েছ মেহরুন, তো ঠিক আছে। আমার জীবনের নুর, আলো তো এই বুকেই ধরা আছে। ইবাদতের কপালে একটু চুমু দিলেন মা।

অচেতন ছেলের কপালে একটা চুমু দিলেন বেগম অঞ্জুমান আরা। আর মুখ তুলতেই চোখে পড়ল বিছানার পাশে সাইড টেবিলে রাখা স্বামী ইজাজত হুসেন খাঁর ছবিটা। যে-ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রেওয়াজ করে

ইবাদত আর কখনো কখনো আপন মনে বলে— ঠিক লগ রহা, অব্বা? কখনো—মঞ্জিল ঠিক হ্যায়, হুজুর? কখনো একটু ঠাট্টার ছলে, কুছ তো বোলিয়ে, উস্তাদ! ছেলে জানেও না মা আড়াল থেকে সব দেখেন, সব শোনেন।

ভোর রাতে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে নিজের ঘরে নেমে এসেছিলেন বেগম অঞ্জুমান আরা। তারপর ভোর হতেই ড্রাইভার উমেদ আলিকে বললেন, গাড়ি নিকালো।

সেলিমকে ডেকে বললেন, সাবকা নাস্তা লগাও। আর ইবাদতকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, মিঞা, কাল বহত পিয়ে হো তুমনে, মুঝে আচ্ছা নহি লগা। অব নহাকে রেডি হো যাও, মুঝে কাম হ্যায় তুমসে। অউর এক বাত আখরি দম তক ইয়াদ রাখনা—পিস্তল খুদকো মারনে কে লিয়ে পয়দা নেহি হুই।

পিস্তল! আকাশ-পাতাল ভাবনা শুরু হয়েছিল ইবাদতের তখনও হ্যাংওভারে আচ্ছন্ন মগজে। আম্মা সাতসকালে হঠাৎ পিস্তলের গপ্পো জুড়লেন কেন!

বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা কাল রাতের ছুড়ে ফেলা পিস্তলটা টেবিলে রাখতে রাখতে শেষ কথাটাও শুনিয়ে গেলেন আম্মা—এরপর নিজের গায়ে তাক করার আগে আমার মাথাতেই দেগে দিও। তোমার আব্বার কাছে অনেক কিছুই পেয়েছি, এখন তোমার কাছে এটাই আমার পাওয়ার আছে।

গাড়িতে উঠে আম্মা উমেদ আলিকে নিশানা বলেছিলেন, মেরিন ড্রাইভ। কাল রাতের কারণে লজ্জায় জড়োসড়ো ইবাদত জিজ্ঞেস করতেও পারেনি—মেরিন ড্রাইভে কোথায়?

মা, ছেলে কারও মুখে কোনো কথা কথা নেই। থেকে থেকেই একটা লজ্জার হাওয়া উঠছে ছেলের মনে। সে আড়চোখে মাঝচল্লিশের মায়ের মুখটার দিকে তাকাল—আহা, কী ভীষণ সুন্দরী আম্মা আমার! অথচ কী দুঃখী মুখ! কতদিন ওই মুখে কোনো স্নেহের আদর পড়েনি! কতদিন ছেলে কোলে শুয়ে ও মুখ ধরে আদর করে বলেনি—আব্বা সে ভি ম্যাঁয় তুঝসে জেয়াদা প্যার করতা হুঁ, মা!

একটা ঘোরের মধ্যে ছিল ইবাদত। সেটা ভাঙল গাড়িটা মেরিন ড্রাইভের ঠিকানায় থামতে। চটকা ভাঙতে ইবাদত দেখল বাড়িটা জন্নতদের। ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আম্মা!

আম্মা কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন গাড়ি থেকে; অগত্যা পিছন পিছন যেতে হল ছেলেকেও। আম্মা দরজায় বেল দিতে ভেতর থেকে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল জন্নত!

বিস্ময়ে হতবাক জন্নতও—আন্টি, আপ! বিস্ময়ের ভেতরে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পুলকও। মাকে নিয়ে ইবাদত তাহলে শাদির কথা পাকা করতে এসেছে। কিছুদিন উখড়া উখড়া থেকে চাপটা তাহলে ভালোই তৈরি করা গেছে। এখন বাকিটা ভালোয় ভালোয় হলে বাঁচোয়া!

জন্নতের মনের কোণে ইবাদতের সেতার বাজতে শুরু করেছে।

অঞ্জুমান বেগম চুপ আছেন দেখে জন্নত ফের বলল, আইয়ে আন্টি!

নীচের হলঘরে পৌঁছে জন্নতকে আম্মা বললেন, বেটি, তোমার মাকে ডেকে দাও।

জন্নত বলল, আপনারা বসুন, আন্টি। আমি মাকে ডেকে আনছি।

অঞ্জুমান আরা বললেন, আজ আমি বসতে আসিনি, বেটি। তুই মাকে ডেকে দে।

চারদিকে মস্ত মস্ত সোফা বিছোনো, কিন্তু অঞ্জুমান আরা বসলেন না। কাজেই দাঁড়িয়ে থাকল ইবাদতও!

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওঁদের দাঁড়ানো দেখে চমকে গিয়েছিলেন মেহরুন বাই। সিঁড়ির ডগা থেকেই বলতে বলতে নামলেন, সে কী আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বেগম সাহেবান! কী সৌভাগ্য যে আজ আপনার পায়ের ধুলি পড়ল এ-বাড়িতে! ওরে জন্নত, একটু নাস্তাপানির বন্দোবস্ত করতে বল।

অঞ্জুমান আরা কিন্তু সেই দাঁড়িয়েই রইলেন। বললেন, আজ আমার কিন্তু বসা হবে না, বহেন। তোমার থেকে শুধু একটা কথা জানার জন্য এসেছি।

সোফাগুলোর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন মেহরুন বাই। ওর পিছনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশী জন্নত। অঞ্জুমান বেগম একবার খুব নজর করে নিজের ছেলেকে দেখলেন, তারপর মেহরুন বাইয়ের মেয়েকে। তারপর খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, মেহরুন, একবারের জন্য আমার ছেলেকে বলে দাও, জন্নত ওর কী হয়?

এক শিশমহলে যেন কোত্থেকে এক পাথর এসে পড়েছে! চমকে উঠে ইবাদত ও জন্নত একে অন্যের দিকে চাইল। কেউ জানে না এরপর উত্তরে কী শুনতে হবে।

মেহরুন মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। অঞ্জুমান বেগম ফের বললেন, বহেন, আমার ছেলেকে এইটুকু শুধু বলে দাও—জন্নতের আব্বা আর ওর আব্বা একই কিনা।

মেহরুন তখনও নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে, অঞ্জুমান বেগম ইবাদতকে বললেন, বেটা, একবার নিজের মুখটা দেখো আর জন্নতের দিকে তাকাও। তোমার চোখ, তোমার নাক, ঠোঁট, কপাল সব মেলাও ওর সঙ্গে। কার ছাপ দেখছ, মিঞা?

এবার মাটির থেকে মুখ তুলে মেহরুন বাই বললেন, হাঁ, ইয়ে সচ। জন্নতের বাবা আর ইবাদতের বাবা এক। জন্নত আমার আর উস্তাদ ইজাজত হুসেন খানসাহাবের ভালোবাসার ফসল।

অনেক চেষ্টা করেও আর জন্নতের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারল না ইবাদত। আম্মা হেঁটে বেরিয়ে যেতে একবারটি জন্নতের দিকে চোখ ফেলতে দেখল অনামিকার থেকে ইবাদতের দেওয়া সিতারের মেজরাবটা খুলে ওর হাতে তুলে দিচ্ছে জন্নত। হিরের আংটি পরাতে গিয়েছিল প্রেমিকাকে যেদিন ইবাদত, জন্নত আংটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমার মেজরাবটাই আমাকে পরিয়ে দাও, জনাব। যে মেজরাবে সেতারে সুর তোলো তাতেই তো আমিও বাজি। শুনতে পাও না! ফেরার পথে সমুদ্রের পাড়ে বহুক্ষণ বসেছিলেন মা ও ছেলে। একটা কথাও বলেনি কেউ, শুধু উঠে আসার সময় মা বললেন, বেটা, জানি তোমাকে ফের একলা করে দিলাম। কিন্তু এও জেনো যে, আমার চেয়ে একলা কেউ নেই দুনিয়াতে। তোমার তবু সেতার আছে, আমার ছিল বলতে তুমি...

‘মাইজি!’ বলে ডেকে উঠেছিল ইবাদত। এরকম বলবেন না, মাইজি! আমি তো আপনারই আছি। সিতার তো বাপ-দাদার জিনিস। জন্নত তো কত

কাছের ছিল, আর এখন কত দূরের! আমার বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে।

বাতাসের তোড়ে ইবাদতের সব কথা যেন কোথায় উড়ে গেল। বাড়ি ফেরার পথে মা ও ছেলে আবার কীরকম নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ একসময় বহুকাল পর গান গেয়ে উঠলেন বেগম অঞ্জুমান আরা দাদা জহিরুদ্দিন খানের তালিমে শেখা মির্জা গালিবের লেখা গজল–

ইবনে মরিয়ম হুয়া করে কোই।
মেরে দুখ কি দয়া করে কোই।।

কথাগুলো কানে যেতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি ছড়াল সারা দেহে ইবাদতের। এ কী কথা গাইছেন মা! এ কি মার মনেরও কথা? মা কেন গাইছেন?

যদি মরিয়মের মতো কন্যা হয়ে আমার দুঃখে প্রলেপ দেয় কেউ। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে আম্মার হাতে হাত রাখল ইবাদত। তারপর আম্মার গান শেষ হতে নরম সুরে বলল, আম্মা, অনেকদিন পর ফের দরবারি বাজানোর মন করছে। আপনি শুনবেন?

৩.

সুমন্ত প্রায় নিঃশ্বাস চেপে বসে আছে সম্পাদকের টেবিলের সামনে। সম্পাদক অরিন্দম বসু একটা করে স্লিপ শেষ করে একেবারে গুম মেরে বসলেন।

প্রথমে পাইপ ধরালেন, তাতে গোটা কয়েক সুখটান দিয়ে মুখে একটা আওয়াজ করলেন, হুম।

ভয়ে ভয়ে সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, কী মনে হল, অরিন্দমদা?

সম্পাদক বললেন, তুমি কি চাও এই লেখাটা ছেপে আমি আর তুমি গারদে গিয়ে বসি?

-কেন বলছেন এটা?

-কেন? কারণ উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান ইজ নো মোর। এ কাহিনি যে ওঁর মুখে শোনা তার কোনো প্রমাণ আছে? এনি টেপ? এনি সার্টিফিকেট? এনি ড্যাম প্রুফ?।

সুমন্ত ধরা ধরা গলায় বলল, না, অরিন্দমদা। কিন্তু এটা তো আমি ফিকশন করেই লিখেছি। ফিকশন!-বেদম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অরিন্দম বসু। একটা অলটাইম গ্রেট মিউজিশিয়ান আর একটা অল টাইম গ্রেট ফিলম হিরোইনের নাম দিয়ে লিখছ আর বলছ ফিকশন!

সুমন্ত বেকুব বনে গিয়ে একটা খড়কুটো ধরার চেষ্টা করল—কিন্তু ওঁদের কেউই তো আর জীবিত নেই।

আরে বাবা, সেটাই তো সমস্যা—এবার ধৈর্য হারাতে বসেছেন সম্পাদক। ওঁদের কেউ নেই তো কী! ওঁদের নামজাদা ছেলেপুলেরা তো আছেন। আর তা ছাড়া জন্নত নামটা তুমি পেলে কোথায়? উনি বলেছিলেন কি?

তোতলামি শুরু হয়ে গিয়েছিল সুমন্তর-নননন-না!

না! আর তুমি সেই নামটা লাগালে? জানতে পারি কেন?

আমম-মমার কেন জানি না মনে হল?

কেন মনে হল? তুমি কি মাইণ্ড রিড করো?

কারণ উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে করেই হোক ওই নামটা আমায় পৌঁছে দেবেন।

আবার চেপে ধরলেন সুমন্তকে অরিন্দম বসু—দিয়েছিলেন কি?

সুমন্ত আমতা আমতা করে বলল, চেয়েছিলেন, পারেননি। কাগজে পড়েননি উনি মৃত্যুর সময় একটা চিরকুটে একটাই নাম লিখেছিলেন?—জন্নত।

সেটা কি তোমার জন্য?

হলে স্যর কাগজটা শেষ অবধি আমার হাতেই এসে পৌঁছোল কেন? সুমন্ত আস্তে করে বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা চিরকুটটা বার করে সম্পাদকের টেবিলে রাখল। তাতে ভীষণ কাঁপা কাঁপা করে উর্দুতে কী একটা লেখা। চিফ সাব সৈয়দদাকে দেখিয়ে নিয়েছিল সুমন্ত। উনি পড়ে বলেছেন, ওতে লেখা আছে ‘জন্নত।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, এটা তোমার কাছে এল কী করে?

সুমন্ত বলল, ফোটোগ্রাফার বিপুল এয়ারপোর্টে ছবি তুলতে গিয়ে খাঁ সাহেবের বডির থেকে এটা ঝরে পড়তে দেখে। তারপর তুলে নিয়ে কাউকে দেবার মতো পায়নি। তখন ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে বডি কোন বাড়িতে আগে যাবে। রবীন্দ্র সদনে আমায় দিয়ে বলল, দ্যাখ, তোর কাজে লাগে কি না। খাঁ সাহেবের বডির থেকে পেলাম।

চিরকুটটা কিছুক্ষণ এক মনে দেখলেন অরিন্দম। সেটা ফেরত দিতে দিতে বললেন, এটা একটা সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দাও।

অ্যাবাউট দ্য স্টোরি আই ক্যান ওনলি সে আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। আমার প্রাণের মায়া আছে, ডিয়ার।

সন্ধ্যেবেলা উস্তাদ ইবাদত হুসেন খাঁর তিলক কামোদ এল পি-টা চালিয়ে প্রায়ান্ধকার ঘরে চুপ করে বসেছিল সুমন্ত। মনে পড়ছিল খাঁ সাহেবের সেই কথাটা—আমি নিউজ পেপারের হেডলাইনে থাকতে চাই না। আমি ইতিহাসে থাকতে চাই, বাবুসাহেব। ঠিক যেরকম এক ছন্দে, ধীরে ধীরে ওর সাক্ষাৎকারটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন খাঁ সাহেব প্রায় সেইভাবেই একটু একটু করে ওর গল্পটা ছিঁড়ে ফেলল সুমন্ত।

তখন কি ওরও চোখে একটু জল ছিল না!

তাঁর জীবনের শেষ দিনটায় মুম্বাইয়ের হাসপাতালের আই সি ইউ-তে বড় অস্থির ছিলেন সিতার নওয়াজ উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান। বিড়বিড় করে কেবল কলকাতায় ফেরার কথা বলছিলেন, আর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বিছানার চাদরে কী একটা আঁকিবুকি কাটছিলেন। ডা: শেঠনা ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে আশ্বস্ত করেছিলেন, খাঁ সাহাব, আপ জরুর কলকাত্তা লওটেঙ্গে। বিলকুল শাহেনশা জ্যায়সা, অউর ঢের সারে গান-বাজানা ভি করেঙ্গে।

ইবাদত খান তখন ফ্যালফ্যাল করে উপরে ধবধবে সাদা সিলিঙের দিকে চেয়ে, আর সেই চোখে তখন দু-ফোঁটা জলও কি ছিল না? বেডের পাশ থেকে সরে আসতে আসতে ডা. শেঠনা নার্স মেরি জনকে বলেছিলেন, আই ডোন্ট নো হোয়াই খান সাহাব ইজ ভেরি স্যাড টুডে। মেরি জন লক্ষ করেছিলেন খাঁ সাহেবের ডান হাতের তর্জনীর কাঁপুনি। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ডা. শেঠনার উদ্দেশ্যে বললেন, ইজন্ট হি ট্রাইং টু রাইট সামথিং, ডক্টর?

ডা. শেঠনা মাথা ঘুরিয়ে দৃশ্যটা দেখে বললেন, অর ইজ হি ট্রাইং টু প্লে সামথিং? দ্যাটস হিজ সিতার ফিঙ্গার, ইজন্ট ইট?

ইবাদত খাঁর চোখ বুজে এসেছিল ততক্ষণে, বন্ধ চোখের পাতা চুইয়ে দু-ফোঁটা জল বেরিয়ে এসে চোখের দু-পাশে গড়াল। ডাক্তার চলে যেতে মেরি জন শিল্পীর মাথার কাছে মুখ নিয়ে কোমল করে বললেন, সাহেব, কিছু বলবেন?

ইবাদত খাঁ চোখ বোজা অবস্থায় বিড়বিড় করলেন কিছু, কিন্তু সে-কথায় ধ্বনি নেই। মেরি জনের চোখ ফের চলে গিয়েছিল শিল্পীর ডান হাতের আঙুলটার দিকে। ফের কী একটা লিখছে যেন ওই তর্জনী। মেরি জন নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, কলম দেব? কিন্তু খাঁ সাহেব কি তা শুনতে পেলেন?

মেরি জন তখন একটা হালকা কলম এনে শিল্পীর হাতে দিলেন আর তার নিবের নীচে একটা ছোট্ট প্যাড ধরে বসলেন।

এতক্ষণের সচল তর্জনী এবার স্থির হয়ে গেল। মেরি জন দেখলেন খাঁ সাহেবের ঠোঁট নাড়াও বন্ধ।

সেদিন মধ্যরাতে উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান দুনিয়ার সব মায়া কাটিয়ে জন্নতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু দম তোড়ার আগে একটাই কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন—

কলকাত্তা যানা হ্যায়। আর মেরি জনের হাতে ধরা প্যাডে প্রায় হিজিবিজি করে আঁকতে পেরেছিলেন একটাই শব্দ উর্দুতে—জন্নত।

প্লেনে করে ওঁর মরদেহ কলকাতায় আনতে আনতে চর্চা চালু হয়েছিল খাঁ সাহেব কলকাতাকেই কেন জন্নত মেনেছিলেন। ওঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী মির বখশ সাহেব বললেন, আরে বলবে না-ই বা কেন? এই কলকাতাতেই কি গোর হয়নি ওর আব্বা মরহুম উস্তাদ ইজাজত হুসেন খাঁ সাহেবের!

উস্তাদের নামটা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কানে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালেন মির বখশ।

মির বখশের পাশের সিটে ছিলেন ইবাদত খাঁর নামজাদা হিন্দু শিষ্য, মুম্বাইয়ের ব্যাবসাদার অরুণ পোপট। তিনি বললেন, পরন্তু মি সাহাব, উস্তাদজি কিন্তু তালিম দিতে দিতে কখনো কখনো বলেছেন, 'জন্নত হ্যায় কি নহি মুঝে পতা নহি। মগর সিতার বজাতে হুয়ে জিন্দেগির্মে কই দফে এহসাস হুয়া কে ম্যাঁয় জন্নতমে হু। ওঁর জন্নত, মির সাব, কলকাতায় বললে সেতারকে একটু হেলাফেলাই করা হবে।

মির বখশ এমনিতেই কম কথার মানুষ, তিনি আর কথা বাড়াননি।

কিন্তু খাঁ সাহেবের দেহ দমদম থেকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে ওঁর শেষ হস্তাক্ষরটি কোথায় যে তলিয়ে গেল, কেউ আর তা মনে করতে পারল না।

তাঁর দুই বিবি ও তাঁদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একটা অনুষ্ঠার দ্বন্দ্বই শুরু হয়ে গিয়েছিল বডি কোন বাড়িতে প্রথম যাবে তা নিয়ে, কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তেও ডান হাতের মুঠোয় ধরা চিরকুটটা নিয়ে কারোই কোনো তাপ-উত্তাপ নজরে পড়ল না।

তবে চিরকুটের ওই 'জন্নত' শব্দটা নিয়ে চর্চার ইতি হল না। খবরের কাগজের প্রতিবেদনেও কথাটার উল্লেখ হল। প্লেনে বসে মির বখশ ও অরুণ পোপটের দু-দুটো ব্যাখ্যাও রসিয়ে লেখা হল কোনো এক পত্রে। রবীন্দ্র সদনে ফুলমালায় ঢাকা খাঁ সাহেবের শবের পাশ দিয়ে একে একে হেঁটে যাচ্ছেন মন্ত্রী আমলা লেখক শিল্পী সংগীতজ্ঞরা যখন, দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে সুমন্ত তখন মনের চোখে বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটা দেখছিল। খাঁ সাহেব অদ্ভুত এক ছন্দে একটু একটু করে ছিড়ছেন ওর লেখা খাঁ সাহেবের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের পান্ডুলিপিটা। আর আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন, আমি ইতিহাসে থাকতে চাই, সুমন্তবাবু, নিউজপেপারের হেডলাইনে নয়।

সস্নেহে 'বাবু' করে ডাকার আদত ছিল খাঁ সাহেবের, অথচ ওই স্নেহের ভাষাতেই জগতের সবচেয়ে কঠিন কথাটাও বলে ফেলতে পারতেন। সেই সন্ধ্যায় যেমন পান্ডুলিপিটা ছিড়তে ছিড়তে বললেন, এত কিছু বললাম তোমাকে আমার সিতার আর জিন্দেগি নিয়ে, তবু তোমাকে লিখতেই হল আমার পেয়ার-মোহব্বত নিয়ে? কিছু নারীর সঙ্গে কতটুকু কী ঘটল তাকেই প্রেম আর ভালোবাসা বলছ, আর সেতারের প্রতি সারা জিন্দেগির এই রিয়াজত, ডিভোশন, তার কোনো দাম নেই?

সুমন্ত তখন খুব নীচু গলায়, কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছিল, কিন্তু সেতার ধরেও আপনি প্রেম আর ভালোবাসাই খুঁজেছেন চিরকাল ...আপনি নিজেই বলেছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে খাঁ সাহেবের মুখ বেশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, নীলচে কালো আকাশ আর নদীর পশ্চাদপটে একটা সিলুয়েটের মতো ধরা দিচ্ছিল মুখটা। প্রশ্ন শুনে ওঁর মুখের কী ভাব হল সুমন্ত দেখতে পেল না, কিন্তু মুখের সরল জবাবটা শুনে বেবাক অবাক হয়ে গেল। খাঁ সাহেব বললেন, হ্যাঁ, প্রেম তো আমি খুঁজেছি, সারাক্ষণ খুঁজেছি...কিন্তু পেয়েছি কি? পেলে, এই দু-হাতে জড়িয়ে রেখে দিতাম বরাবরের মতন, যেমন করে ধরে রেখেছি সিতারকে। সুমন্ত চুপ করে ছিল, মাথার মধ্যে খেলাচ্ছিল কী করে এইমাত্র টুকরো টুকরো হওয়া সাক্ষাৎকারটাকে নতুন করে লিখবে। লিখলে তাতে এইমাত্র শোনা কথাগুলোও কীভাবে কোথায় জুড়বে। ওকে চুপ দেখে কিংবা নিজের কথাতেই একটু অবাক হয়ে খাঁ সাহেবও চুপ করে গিয়েছিলেন। দু-জনের মধ্যে একটা মাছির ভনভনানি ছাড়া কোনো শব্দ ছিল না। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে খাঁ সাহেব বলে উঠেছিলেন, পেয়ার হয়নি এত বদনসিব আমি নই, সুমন্তবাবু। কিন্তু পেয়ার হওয়া মানেই কি পেয়ার পাওয়া?

জীবনে তো অনেক কিছুই আসে, হয়, ঘটে, কিন্তু তার মানেই কি তা পাওয়া যায়? জীবনে কম তো সিতার বাজাইনি, তা বলে কি ভৈরবের ঋষভটা একবারও আব্বা ইজাজাত খাঁ সাহেবের মতো টানতে পেরেছি?

সুমন্ত ইবাদত খানের প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা না করে বলেছিল, কিন্তু আপনার তিলক কামোদ রেণ্ডারিং পৃথিবীকে আপনার প্রেমের কথাই শোনায়। প্রেমে না পড়লে তিলক কামোদের ওই চেহারা কি আসে, খাঁ সাহেব? আই মিন নারী-পুরুষের প্রেম।

সরলভাবে হেসে খাঁ সাহেব বলেছিলেন, আসে না বুঝি? সুমন্ত কথার জবাব দিচ্ছে না দেখে ফের বলেছিলেন, তুমি ঠিকই ভেবেছ—আসে না। চাঁদ না

দেখলে চাঁদের বর্ণনা দেওয়া যায় না। তবে চাঁদ দেখা গেলেই কি চাঁদকে পাওয়া হয়, বাবু?

প্রেম তা হলে এতই দূর?—জিজ্ঞেস না করে পারেনি সুমন্ত।

খাঁ সাহেব তখন স্বগতোক্তির মতোই বলেছিলেন, সবই নির্ভর করে জীবনের এত নারী, এত সম্পর্কের মধ্যে ঠিক কোনটিকে তুমি সেই একটা প্রেম, একটা চাঁদ, সেই ভৈরবের ঋষভ বলে ধরতে চেয়েছ, কিন্তু পারেনি। একটা স্বর্গ ... একটা জন্নতও বলতে পারে, যার খবর তোমার আছে, কিন্তু তুমি গিয়ে পৌঁছাতে পারলে না।

ইবাদত হুসেন খান এরপর নীচু হয়ে মাটির থেকে কাগজের টুকরোগুলো যত্ন করে কুড়িয়ে পাশের ছোট্ট টেবিলে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, এই যে সব নারীর কথা লিখেছ, এদের সবার কথা আমিই বলেছি...ঠিক কথা। কিন্তু বলতে যে পারলাম তা তো ওই জন্যই কি এরা সব একেকটা ঘটনা আমার জীবনে। কিন্তু এই সব কহানির মধ্যে ওই যে একটা প্রেম কোথায় হারিয়ে গেল তা কি আর তুমি জানতে পারলে? না তোমার রিডার কোনোদিন জানতে পারবে? তোমরা আমার তিলক কামোদের রোমান্টিসিজমটাই দেখতে পাও, তার পিছনের দর্দ-এ-দিল, বুকের রক্ত দেখতে পাও? তোমার এই ইনটারভিউয়ে আমার মুহববত বলে অনেক মিঠি বাত, মিঠি বোলি, মিঠা দর্দের কথা লিখেছ, পড়তে বেশ মজাও আসছে...বাট ইজ দ্যাট মাই লাভ? যা কিনা আমি পঞ্চাশ বছর ধরে এই ভাঙা বুকটায় এই এইরকম করে লুকিয়ে আসছি?

ইবাদত খাঁ এমন করে দু-হাতে বুকটাকে আগলে ধরলেন যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে বুকে নিয়েছেন। সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, এই পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যথাটা বুকে ধরে রেখেছেন কোনোদিন কাউকে বলবেন না বলেই কি?

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছিল, নদীর পাশের বাড়ির ছাদে আরামকেদারায় বসা খাঁ সাহেবকে এক রাশ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—বলব কী করে বাবুসাহেব? বাজনাতেই পুরো ঢালতে পারি না। একটা সিগারেট ধরিয়ে কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ইবাদত খাঁ, একটা লম্বা টান দিলেন সিগারেটে, তারপর আস্তে করে হেঁটে গিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সেই চাঁদ, সেই প্রেম নিয়ে বলতে গেলে রাধার দশা হবে। যাকে সখীরা প্রশ্ন করছে, হ্যাঁ রে, তোর কৃষ্ণকে দেখতে কেমন? আর সে বলছে, কী করে বলি বল? যে জুবান বলবে তার তো আঁখ নেই, আর যে আঁখ দেখে তার তো জুবান নেই।

খাঁ সাহেব হাসছিলেন, কিন্তু অন্ধকারে ওই হালকা হাসিটাও বড়ো করুণ শোনাচ্ছিল সুমন্তর কাছে। হাসি মিলিয়ে যেতে কাঁপা কাঁপা গলায় সুমন্ত বলেছিল—আমি খুব সাধারণ একজন সাংবাদিক, খাঁ সাহেব। আপনি কি চাইবেন না আপনার এই লুকোনো, না বলা প্রেমের কাহিনি লিখে একটু সমাদর পাই মানুষের? একটু নজর...?

ফের এক রাশ নৈঃশব্দ্য নেমেছিল নদীর পাড়ের খোলা ছাদে। একটা ঝিরঝির বাতাসও উড়ে এসেছিল কোত্থেকে। ঘন কালোর মধ্যে টেবিলে রাখা ছেঁড়া পান্ডুলিপির সাদা কাগজগুলো একটু বেশি রকম সাদা ঠেকছিল, রাতের সমুদ্রতটে ঢেউয়ের সাদা ফেনার মতো। সুমন্তর গলায় একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল চাপা কান্নার। ওর মনে হল, খাঁ সাহেবকে একটা প্রণাম করে বাড়ি

ফিরে যায়। বোধ হয় উঠতেই যাচ্ছিল সুমন্ত, হঠাৎ পিঠে ভারী দুটো হাত ইবাদত হুসেন খাঁর, আর স্নেহ ঝরে পড়া গলায় আদেশ-বোসো!

সুমন্ত তো তখনও বসে, পিছন ফিরে উপরে চেয়ে বলল, কিছু বলবেন, সাহেব?

খাঁ সাহেবের কন্ঠ ভেসে এল, কত অবধি রাত জাগতে পারো, বাবু? কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সুমন্ত বলল, কেন, সাহেব?

খাঁ সাহেবের কথা ভেসে এল ফের, কেন, আমার প্রেমকহানি শুনবে যে!

সুমন্ত বলল, তা হলে সারা রাত!

'তাহলে এসো' বলে ইবাদত হুসেন খাঁ ওর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন বাড়ির সদর দরজায়, বাবুর্চি হানিফকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। সে 'জি হুজুর! জি হুজুর'! করে দৌড়ে আসতে বললেন, দশ বাজে করিব খানা লগানা সাহাবকে লিয়ে। মেরে লিয়ে বস এক স্যুপ। হম অব বৈঠেঙ্গে নদী কে কিনারে...প্রমাদ গুনেছিল হানিফ। বাইপাস হওয়া অসুস্থ শরীরে নদীর পাড়ে খাঁ সাহেব? সে শিউরে উঠে বলল, সাব, ইস ওয়ক্ত! খাঁ সাহেব শুধু গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, হানিফ! হানিফ চুপ মেরে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ, খাঁ সাহেব গায়ের হালকা চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে বলেছিলেন, এরা জানেই না আমি কবেই মরে গেছি, এরা সি একটা লাশকে পাহারা দিচ্ছে। খাঁ সাহেবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুমন্ত অনুযোগ করেছিল, কেন এমন অলক্ষুণে কথা বলেন, সাহেব?

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ইবাদত হুসেন খাঁ বলেছিলেন, বাবুসাহেব, যতবার আমি দরবারি ধরি ততবারই আমি মরি...তুমি জানো না?

তারপরই ওঁর ওই দিলখোলা 'হাঃ হাঃ হাসিতে কেঁপে উঠেছিল নদীর পাড়।

রবীন্দ্র সদনের ফয়ারে নরম করে বাজছিল খাঁ সাহেবের সেই সব দরবারির কোনো একটা। মানুষের ঢল নেমেছে সদনের চত্বরে, অদূরে আঁচলে চোখের জল মুছছে দু-টি বাঙালি মেয়ে, এক বৃদ্ধ মোল্লা আকাশের দিকে চেয়ে কীসব বলে যাচ্ছেন আপন মনে, আর সুমন্তর শুধু মনে পড়ছে নদীর পাড়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসা খাঁ সাহেবকে।

তুমি জানো, বাবুসাহেব, আমি আম্মা অঞ্জুমান আরা সাহেবানের আদেশে গান গাওয়া ছেড়েছিলাম!—এক সুদূর কণ্ঠে বললেন ইবাদত হুসেন খান। উনি কোনো জবাব চাইছিলেন কিনা না বুঝতে পেরে সুমন্ত বলেছিল, তাই তো শুনেছি।

ঝাঁ করে শিল্পী বললেন, কোথায় শুনেছ? আমতা আমতা করে সুমন্ত বলল, হয়তো পড়েছি কোথাও।

অল রাবিশ! যত নিউজপেপার ফিকশন। নাও ইউ হিয়ার ফ্রম মি... বাট!

বাট?

আমার কহানি কোনো ইন্টারভিউ করে লিখবে না।

বুঝলাম না জনাব।

ইবাদত হুসেন খান হাতের সিগারেটটা নদীর জলে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, রাইট ইট লাইক স্টোরি, লাইক হিস্ট্রি, যেমন কিনা ‘সাউণ্ড অব মিউজিক’ সিনেমা, যেখানে হাসি থাকবে, কান্না থাকবে, গানও থাকবে, অ্যাণ্ড ইট উইল অলসো বি আ ভেরি টু স্টোরি অব লাইফ। শুধু একটা নাম তুমি

সেখানে ইউজ করতে পারবে না...কার নাম, সাহেব?–জিজ্ঞেস করে বসেছিল সুমন্ত।

খাঁ সাহেব বললেন, তার নাম, যাকে নিয়ে কহানি।

প্রমাদ গুনল সুমন্ত, সে কী! যাকে নিয়ে গল্প তারই নাম করা যাবে না! দেন হাউ উইল ইট বি টু?

ইবাদত খাঁ আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বিকজ আই অ্যাম টেলিং দ্য স্টোরি। আর নামে কী এসে যায়? করে দাও লায়লা কি মুমতাজ কি রিজিয়া...

সুমন্ত বলল, তা হলে আপনার জীবনের সেই একটাই চাঁদ মেঘেই ঢাকা থেকে যাবে!

ইবাদত খাঁ বললেন, না, থাকবে না। দুনিয়ার যেখানেই আমার ইন্তেকাল হোক, সেই নাম তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর জানো তো বাবু, আমার সময় বেশি নেই। একেক দিন শুতে গেলে মনে হয় সব তো পাব না। কে জানে কালকের সকালও দেখতে পাব কি না!

খাঁ সাহেবের কথায় শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল সুমন্তর। খাঁ সাহেব বললেন—তোমার কহানিতে আমার সেই পুনমকে চাঁদের নাম যা খুশি রাখো, কিন্তু দেখো ওর গায়ে যেন কলঙ্ক না লাগে।

সুমন্ত বলল, কলঙ্ক তো চাঁদেরই হয়, জনাব। যাতে আরও সুন্দর হয় চাঁদ।

এবার উপরে আকাশের দিকে চোখ মেলে সরু একফালি বিবর্ণ চাঁদ দেখতে দেখতে ইবাদত খাঁ বললেন, জানি। আর এও কি জানি না, ইতিহাস লেখা হলেও ইতিহাস থেকে যায়? আর তা মানুষ জেনেও যায়। যে-জন্যই কিনা হিন্দোস্তানের এক সেরা শায়ের লিখেছিলেন সেই কত কত বছর আগে

পত্তা পত্তা বুটা বুটা
হাল হমারা জানে হ্যায়।
জানে ন জানে গুলহি ন জানে
বাগ তো সারা জানে হ্যায়।

বুঝলে কিছু? কবি বলছেন, পাতায় পাতায়, কুঁড়িতে কুঁড়িতে আমার অবস্থা জানাজানি হয়ে গেছে। ফুল জানুক বা না জানুক, বাগিচা সব জানে।

তারপর কী একটা সুর ভাঁজতে শুরু করেছিলেন খাঁ সাহেব, আর তারই মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নাও, চলো। আমার বলতে ইচ্ছে করছে...। তারপর আর সেই রাতের কিছু মনে নেই সুমন্তর। কিছু লেখেনি, কিছু টেপে রেকর্ড করেনি, শুধু শুনেছে...কখন চাঁদ আর সঙ্গী তারারা মিলিয়ে গেছে ভোরের আলোয় জানতেও পারেনি। কথা শেষ করে কখন উস্তাদ ওরই কোলে কাশতে কাশতে ঘুমিয়ে পড়েছেন...বেচারি হানিফ এসে ভয়ে ভয়ে ডেকেছে, সাব! খাঁ সাব! সুবহ হো রহা, ম্যাঁয় চায় লাউ?

সেদিন সন্ধ্যায় খাঁ সাহেবকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে এল সবাই। তার তিন দিন পর নিয়ে যাওয়া হল মুম্বাইয়ের যশলোক হসপিটালে। বলা হল ফুসফুঁসে ক্যান্সার। এও শোনা গেল সময় মতো ধরা পড়ায় পরমায়ু হয়তো বছর খানেক বাড়ল। তারপর দু-মাস না যেতেই ...

খাঁ সাহেবের বডি ফের কাঁধে তুলেছে সবাই, এবার যাত্রা শুরু কবরের দিকে। হাতের পান্ডুলিপিটা বুকের কাছে ধরে স্থির হয়ে সেই এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুমন্ত সকাল থেকে। খবরের কাগজে জন্নত শব্দটা নিয়ে চর্চার কথা পড়ে গল্পের সাবখান থেকে জরিনা নামটা কেটে কেটে জন্নত করেছে। কারণ? ওর মন বলছে শেষ চিরকুটে নামটা লিখেছিলেন খাঁ সাহেব মেঘ সরিয়ে বুকের চাঁদটাকে একবার বারে আনতে। শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটাকেও মুক্তি দিয়েছিলেন...

২.

হাই কমিশনার কৃষ্ণ মেনন সাহেব ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, দেশে ফেরার জাহাজ টিকিট চাইতে এলে তো, ইবাদত? ওটা এখন পাবে না। কিপ প্লেইং অ্যাণ্ড এনজয় ইংল্যাণ্ড।

সুদর্শন তরুণ সেতারি উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান হাই কমিশনারের মস্ত টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে আস্তে করে বসতে বসতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কিন্তু আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে, স্যর।

এবার চোখ তুললেন কৃষ্ণ মেনন—হোয়াই?

আবার গলা ধরে যেতে বসল ইবাদতের, আজ্ঞে, মন খারাপের কি কোনো ‘কেন’ আছে স্যর?

কৃষ্ণ মেনন বেল প্রেস করে দু-কাপ চা আর কিছু বিস্কুট অর্ডার করলেন। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লেন—আই ডোন্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ আর্টিস্টস! টাকা, যশ, আরাম, ফুর্তি সব পাচ্ছ এখানে, আর তার পরেও ইউ স্টিল ওয়ান্ট টু গো হোম। কী আছে দেশে বলো তো আমায়।

ইবাদত মিন মিন করে বলল, আসলে মনটা তো মনই। কিছু বোঝে না স্যর।

চা আসতে কৃষ্ণ মেনন চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতে খেতে বললেন, তাহলে মনটাকে এত পাত্তা দাও কেন? লুক হাউ হ্যাণ্ডসাম ইউ হ্যাভ বিকাম ইন জাস্ট সিক্স মানথস! সাহেবদের মাথা খারাপ করে দিয়েছ এই ক-দিনে। সবাই বলছে ইউ আর দ্য বেস্ট ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট আফটার ইণ্ডিপেন্সে। বেহালার লেজেণ্ড ইয়াশকা হাইফেজ, হিরোইন ইনগ্রিড বার্গম্যান, জিন সিমনস, হিরো ওয়াল্টর পিজন ...এঁদের সঙ্গে তুমি প্রোগ্রামে নামছ, ফেস্টিভাল অব ব্রিটেনের ইউ আর আ স্টার। অ্যাণ্ড ইউ ওয়ন্ট টু গো ব্যাক হোম। আমি বুঝতেই পারি না কেন।

ওঁর কথার তোড়ে ইবাদত ওর কাপে চুমুক দিতে পারছে না দেখে একটু থামলেন কৃষ্ণ মেনন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, হয়তো এই জন্যই তোমরা আর্টিস্ট। আর আমরা ...

সাহেবের কথা ঠিক শুনতে না পেয়ে ইবাদত বিব্রতভাবে বলল, আজ্ঞে, আমায় কিছু বললেন, স্যর?

কৃষ্ণ মেনন বললেন, হুম! বলার আর কী আছে? শুধু জানার ইচ্ছে একটাই—তুমি কেন চলে যেতে চাইছ? গিভ মি ইন ওয়ান সিম্পল সেনটেন্স। আমি ওই সব মন-ফন বুঝি না, আই অ্যাম নট অ্যান আর্টিস্ট।

ইবাদতের চোখের সামনে তখন ভাসছে জাহাজঘাটায় ওকে সি-অফ করতে এসে মস্ত জাহাজটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা জন্নতের চোখ দুটো। নদীর জল জলের মতো নীল চোখেও তখন দু-ফোঁটা জল। তার একটু আগেই জিজ্ঞেস করেছিল—আমার সিনেমায় নামায় তোমার এত ভয় কেন, ইবা?

ওটা খারাপ লাইন? সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকার ঠোঁটটা ওর ডান হাতে চেপে ধরে বলেছিল ইবাদত, না, না, তা কেন? তা কেন? ওভাবে তো ভাবিই না কখনো।

তাহলে?—তখন অভিমান জন্নতের গলায়।

ইবাদত বলেছিল, শুধু তোমাকে হারাবার ভয়।

জন্নতের সব অভিমান ফের ভর করেছিল গলায়, সেজন্যই জাহাজে করে বিলায়েত পাড়ি দিচ্ছ তো জনাব?

ইবাদতের চটকা ভেঙেছিল কৃষ্ণ মেননের কেতাদুরস্ত অর্ডারের ভঙ্গিতে—আমাকে স্রেফ একটা বাক্যে তোমার কারণ বলো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

ইবাদত আকাশ-পাতাল বহুত কিছু ভেবে শেষে একটা ছোট্ট বাক্য উগরে দিল—আই অ্যাম ইন লাভ, স্যর।

চব্বিশ দিন ধরে জাহাজে এই একটাই বাক্য আবৃত্তি করতে করতে এসেছে ইবাদত। আই অ্যাম ইন লাভ ... আই অ্যাম ইন লাভ ... আই অ্যাম ইন লাভ ... সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে বয়ে যেতে যেতে ডেকে দাঁড়িয়ে বাক্যটা আবৃত্তি করছিল ইবাদত, হঠাৎ মনে হল ওর, এটা খুব সহজ কথা নয়। কোথায় একটা পাওয়ার এবং অথরিটির ছাপ আছে। যেন শেরের মতলা, কবিতার প্রথম কলি। বোম্বাইয়ে বাড়ি ফিরে ইবাদত প্রথম ফোনটা করেছিল জন্নতকে। সাত মাসে আরও সুন্দর হয়েছে ওর কণ্ঠস্বর—হ্যালো।

কোনো ভণিতা নেই, নখরা নেই, কেমন আছ?' 'কী করছ?'-র বালাই নেই, ইবাদত এতকাল ধরে মকশো করার পরও প্রায় আনাড়ির মতো কাঁপুনি ধরা

গলায় বলল, আই অ্যাম ইন লাভ। তারপর সেনটেন্স কমপ্লিট করার জন্য জুড়ল—উইথ ইউ! কিন্তু ওপার থেকে কোনো স্বর ভেসে এল না। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার আওয়াজ।

ইবাদত ফের বলল, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙল না।

ইবাদত আবার বলল, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ, জন্নত। এবার ফোনটা রেখে দেওয়ার আওয়াজ হল।

সেই সন্ধ্যায় বাড়ির বার হল না তরুণ উস্তাদ, গোটা বোম্বাই শহরটাকে যেন কবরের ঠাণ্ডায় ধরেছে। ও সেতারের রেওয়াজেও বসল না। বহুদিন পর দম দেওয়া গ্রামোফোনটা নামিয়ে ঝাড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বিলেত থেকে আনা নতুন পিন লাগিয়ে তাতে একটা রেকর্ড চাপাল। নিজের রেকর্ড? না আব্বাজানের? না। প্রিয় গাওয়াইয়া বড়ে গুলাম সাহাবের? না। প্রিয় আমির খাঁ সাহাবের? তাও না। দু-বছর হল বেগম আখতার সাহেবান ওকে ওঁর এই রেকর্ডটা উপহার দিয়ে বলেছিলেন, আনন্দের সময় শোনার মতো অনেক কিছুই আছে তোমার। এটা রাখো কোনো দুঃখের রাতের জন্য, ইবাদত।

এমনিতেই দুঃখে ডুবে থাকা স্বভাব ইবাদতের, নতুন করে বেদনা জাগানোয় বড়ো ভয়। আজকের মনের ব্যথায় সেই ভয়টাও যেন উবে গেছে। ও চোখ মুছতে মুছতে টার্নটেবলে রেকর্ড চাপিয়ে দিল। দাগ-এর শের নিয়ে বেগম আখতারের গজল

উজর আনে মেঁ ভি হ্যায়
অউর বুলাতে ভি নেহিঁ।
ওয়ায়েসে তারিকে
মুলাকাত বতাতে ভি নেহিঁ।
খুব পরদা হ্যায় কে
চিলমন সে লাগে বৈঠে
সাফ ছুপতে ভি নেহিঁ
সামনে আতে ভি নেহিঁ।

বেগম একটা একটা করে সুর লাগান আর ইবাদত ‘হায়! হায়!’ করে কপালে একটা চাপড় মেরে বলে—আরে, এই তো তিলক কামোদে লাওনর শকল। এই তো সেই ব্যথার মুখ, বুকের ধড়কন।

তারপর আস্তে আস্তে সুর ভুলে কথার চক্করে পড়ে ইবাদত। ৭৮-অর পি এম পুরো ঘুরে যেতে ফের নতুন করে চালায়। বিশ-বাইশ বারের পর নিজের সঙ্গে কথা শুরু হয় ইবাদতের—সালাম দাগ দেহলভি সাহাব! তুমি কোথায় পেয়েছিলে আমাকে অতকাল আগে? এত দুঃখ তো শুধু আমারই আছে সাহেব, তুমি কোথায় পেলে সেসব?

কী সুন্দর বলছ তুমি দাগ, যেন আমিই বলছি। চিয়ার্স টু ইউ, মাস্টার! বলে এবার গেলাসের স্কচটা শূন্যে তুলে ধরল ইবাদত।

তারপর জানলার বাইরের অন্ধকার আরব সাগরের দিকে চোখ মেলে বলল, ঠিকই ধরেছ, দাগ। না আসার হরেক ওজর দেখায় সে, অথচ আমাকেও ডাকে না। বলে না কবে দেখা হবে, তাও। এমন করে সে নিজেকে ঢেকে রাখে চিকের আড়ালে, যে দেখাই পাই না। পুরো লুকোয় না, আবার স্পষ্ট করে

ধরাও দেয় না। সত্তর বার রেকর্ডটা বাজিয়ে আর দুটো করে বরফ দিয়ে এগারো পেগ হুইস্কি খেয়ে ইবাদত বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ঘরে। দরজায় টোকা মেরে সাতবার ফিরে গিয়েছিলেন আম্মা অঞ্জুমান বেগম। ছেলে 'আসুন!' না বললে দরজা ঠেলে ডোকা আদত নয় ওঁর। কিন্তু ভোর রাতে আর না এসে পারেননি।

আর ঢুকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়েছিলেন—হায়, আল্লা! ইয়ে তো বিমার পড়ি! বাকি দিনটাও ঘুমে কাদা হয়েছিল ইবাদত, দুপুরের খাওয়াও বরবাদ হল। সন্ধ্যে সাতটায় ঘুম ঝেড়ে উঠে প্রথম কাজটা হল জন্নতের বাড়ির নম্বর চাওয়া। ফের সেই নায়িকা কণ্ঠে 'হ্যালো?' ইবাদত খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কেমন আছ?

একটা আড়ষ্ট উত্তর এল, ভালো।

ইবাদত বলল, আমার শেষ চারটে চিঠির জবাব পাইনি।

জন্নতের কোনো জবাব নেই।

ফলে ইবাদতই ফের বলল, তোমাকে সারাক্ষণ মিস করেছি।

জন্নতের প্রায় ঠাট্টার সুর-অ!

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

এত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী আছে?

তোমার-আমার যা মরাসিম, রিশতা, তাতে বিশ্বাসের কথা আসবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সম্পর্ক তো আছেই। দূরে সরে থাকার সম্পর্ক।

ওহ! ওহ! ওহ! ইয়ে হি ন বাত? দূরে কি শখ করে চলে গিয়েছিলাম? মা আর মামা মিলে তো জোর করে, ছক কষে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে আমাদের টানটা কমে যায়।

—ভালোই তো করেছেন, যা হবার নয়, তাকে বেশিদূর গড়াতে দেননি। এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল ইবাদত, কী হবার নয়! যে সম্পর্কের স্রোত এতদূর গড়িয়ে এসেছে তাকে পিছনে ফেরাবে কে? এত অনুরাগের কথাটার বিশেষ দাগ বোধ হয় পড়ল না জন্নতের মনে। সে ফোন ছাড়ার তোড়জোড় করল—রাখছি। আমায় বেরোতে হবে।

ছাড়বে না ইবাদতও—কেন, কোথায় যাবে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল জন্নত—শুটিঙে।

আর ফোন রেখে দিল।

ইবাদত বিশ্বাস করতে পারছিল না, এ-ই সেই জন্নত যাকে বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় হাত নাড়তে দেখে আরব সাগরটাকে ওর কালাপানি মনে হচ্ছিল, যা পেরিয়ে ওপারে গেলে আর নাকি ফেরা হয় না। হঠাৎ হাঁটুর কাছটায় খুব দুর্বল ঠেকছিল ওর, কোনোমতে রেলিংটা চেপে ধরে নিজেকে সামলেছিল। আর রাতে কেবিনে চিঠি লিখতে বসে বাইরে সমুদ্রের ঢেউ দেখে একটা প্রিয় গজলের দুটো কলিই লিখে দিয়েছিল

দিলঁ মে এক লহর সি
উঠি হ্যায় অভি!
অউর তাজা হাওয়া
চলি হ্যায় অভি।।মনের মধ্যে ঢেউ আর বাতাসের কথার উত্তরে ওর মা মেহরুনের বহু পুরোনো একটা গজলের দুটো কথা লিখে দিয়েছিল জন্নতও—

আরজুয়েঁ হজার রখতে হ্যাঁয়।
তো ভি হম দিল কো মার রখতে হ্যাঁয়।।

আহা, কী জবাব! হাজারো বাসনা মনে, তবু মনকে রাখি বেঁধে। ইবাদত ধরতে পারেনি কার শের, তাই পরের চিঠিতে লিখল, প্রিয়তমা, তোমার মনের কথাটা কোন শায়েরকে দিয়ে বলালে, গোগা?

সেবার একটা গোটা কাগজে শুধু একটাই কথা লিখে পাঠিয়েছিল জন্নত-মীর!

সেই জন্নতই এখন ফোন রাখতে পারলে বাঁচে।

ইবাদত স্নান সেরে একটা হুইস্কি নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নীচের থেকে আম্মার ডাক এল—ফুরসত হোত নীচে উতরানা, বেটা!

বুকটা ধক করে উঠল উস্তাদের; এত গম্ভীর করে ডাকলে তো আম্মা অদ্ভুত আবদার জোড়েন। একবার শুনো মিঞা' বলে পাশে বসিয়ে গভীর রাতে বলেছিলেন, তুমি আমার ভাইসাবদের কাছে গান শিখছ, ভালো কথা। ঢের শিখেছ, এবার বন্ধ করো। তোমার বাপের ঘরের সম্পদ হচ্ছে সেতার, সেই সেতারেই ডুবে থাকো।

বুকটা ব্যথায় মুজড়োচ্ছিল ইবাদতের। করুণ চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন মা? এত ভালো গান আপনার বাপের বাড়ির, সেই গান গাওয়া কি দোষের? আম্মা বলেছিলেন, আর আমার স্বামীর ঘরে যে এত অতুলনীয় এক সিতার বাজ! ইবাদত বলল, কিন্তু আমি যে দুটোই চাই! আম্মা বললেন, তাহলে তুমি আব্বার চেয়ে বড়ো শিল্পী হবে কী করে?

কিন্তু আমি চাইলেই কি আব্বা জানের চেয়ে বড় সেতারি হতে পারি, মা?

তোমার আব্বা তো সেটাই চেয়েছিলেন, মিঞা। আর ওঁর ইন্তেকালের দিন আমাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন।

কী শপথ, মা?

যে, এমন করে গড়ব তোমাকে যে দুনিয়া একদিন সিতার বলতে ইবাদত বুঝবে, ইবাদত বলতে সিতার। সেদিন বহু রাত অবধি মা ও ছেলে পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিল। ঊষার প্রথম আলোয় পুত্র বলেছিল, মা, আমি গান ছেড়ে দিলাম। সেতার ছাড়া আর কিছু থাকবে না আমার।

ইবাদত এই সবই ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে দেখল টেবিলের উপর আব্বার একটা ফটোগ্রাফ রেখে পাশের কৌচে বসে আছেন আম্মা অঞ্জুমান আরা বেগম। ছেলে আসতে পাশের চেয়ারটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

ইবাদত বসতে মা বললেন, তোমার শরীরে খুব কষ্ট আছে, জানি।

ইবাদত চাপা গলায় বলল, মনেও।

মা বললেন, তাও জানি।

কিন্তু আপনি তো আমার ব্যথা বুঝছেন না। আমি সত্যিই জন্নতকে ভালোবাসি। আপনি ভেবেছিলেন আমাকে বিলাত পাঠিয়ে দিলে আমি ওকে ভুলে যাব।

কিন্তু ও তোমাকে ভুলতে পেরেছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ইবাদত—কেন এমনটা বলছেন আপনি, আম্মা? বহু কষ্ট চেপে রেখে ও দূরে সরে আছে। আমি শাদি করে ওকে ঘরে তুলে আনতে চাই।

একটা লম্বা সময় চুপ করে রইলেন অঞ্জুমান বেগম। শেষে বললেন, সেটা হবে না।

কীরকম নিষ্ঠুর শোনাল মার কথাটা। ইবাদত এবার একটু রাগত ভাবেই বলল, কেন, ও একজন বাইজির মেয়ে বলে?

অঞ্জুমান বেগম বললেন, কক্ষনো না। আমি একটা গানের ঘরের মেয়ে হয়ে এমনটা মনে করতেই পারি না। তা ছাড়া মেহরুনের মতো গাইয়ে ক-টা হয়েছে দুনিয়ায়?

ইবাদত বেশ অবাকই হয়েছিল আম্মার মুখে মেহরুন বাইয়ের এই প্রশংসায়। হয়তো এই প্রথমবার জীবনে মেহরুনের গানের এই প্রশংসা শুনল আম্মার মুখে। তাই সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কলকাতার বাড়িতে তো কোনো দিনও কোনো রেকর্ড দেখিনি মেহরুন বাইয়ের। তাহলে কোথায় শুনলেন ওনার গান আপনি? আম্মা বললেন, কেন, রেডিয়ো বলেও তো একটা জিনিস আছে।

তোমার আব্বার সঙ্গে কম জলসাতেও তো যাইনি এককালে। ভুলে যেও না, মেহরুন একসময় ন-বছর কাটিয়েছে কলকাতায়, হর শাম মেহফিল বসিয়েছে ওর বাড়িতে, তোমার আব্বাও দিব্যি ভক্ত হয়েছিলেন ওঁর খেয়াল গজল ঠুংরির!

তাহলে আপনার এত আপত্তি কীসের, আম্মা?—প্রায় কাতরোক্তি করে উঠল ইবাদত।

যেহেতু তোমার অউরত হিসেবে আমি ওকে ভাবতেই পারি না—সোজা জবাব দিলেন অঞ্জুমান বেগম।

ইবাদতেরও মেজাজ চড়ছিল একটু একটু করে। বলল, তার মানে জন্নতকেই আপনার পছন্দ না?

বেগম বললেন, খুব পছন্দ। ও সিনেমায় নামা সত্ত্বেও। কিন্তু তোমার বিবি হিসেবে ওকে আমি পছন্দ করব না কোনোদিনই। কিন্তু কেন, আম্মা? এ তো বঢ়ি তাজ্জব কি বাত!—ফের এক কাতরোক্তি ইবাদতের কণ্ঠে।

বেগম গম্ভীর সুরে বললেন, হাঁ বহত তাজ্জব কি বাত। মগর কভি কভি তাজ্জব কি বাত

ভি মাননা, পড়তা, মিঞা।

ইবাদত বলল, তা কি আমি মানিনি আগে, আম্মা? আপনি বলেছেন, আমি গান ছেড়ে দিয়েছি। আপনি বলেছেন, আমি কালাপানি পার করেছি। আর এখন আপনি বলছেন, আমার ইশক, আমার পেয়ার, আমার চোখের আলো,

মনের প্রদীপ জন্নতকেও ছেড়ে দিতে। এর চেয়ে ভালো ছিল আপনি আমাকে প্রাণপাখিটাকেই ছেড়ে দিতে বলতেন।

অঞ্জুমান বেগম চুপ করে ছিলেন, ইবাদত মাথা নীচু করে বসে রইল অনেকক্ষণ, শেষে দুঃখে ভরাডুবি হতে হতে একটা শের আউড়াতে লাগল :

জুর্মে উলফত পে হমেঁ লোগ
সজা দেতে হ্যাঁয়।
ক্যায়সে নাদান হ্যাঁয় শোলোঁ কো
হাওয়া দেতে হ্যাঁয়।

ভালোবাসার অপরাধে লোকে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে... বেশ বলেছেন সাহির সাব। দিন, দিন, দিন, যত পারেন শাস্তি দিন। আম্মা, দোষ তো আমার একটাই—আমি ভালোবেসেছি। তবে জেনে রাখুন মা, আপনার কথা তো আমি ফেলতে পারব না, জন্নতকে আমার ছাড়তেই হবে। কিন্তু অন্য কোনো মেয়েকেও আমি বিয়ে করব না, তাতে ইজাজত খাঁর সেতার বংশ লোপ পেয়ে যাবে।

ইবাদত উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ফের বেগম আখতারের রেকর্ডটা টার্নটেবলে চাপিয়ে একটা ড্রিংক নিয়ে বসল। যে খিদেটা কিছুক্ষণ আগে চাড়া দিয়ে উঠছিল ভেতরে হঠাৎ করে সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল। হাতে ড্রিংকের গেলাস ধরে আখতারী বাইয়ের গজলের মকতা শের, যেখানে কবি দাগের নাম আসছে, সেই কথাগুলো আসতেই হিজ মাস্টার্স ভয়েসের লেবেলের সেই কুকুরের মতো গ্রামোফোনের একদম পাশে গিয়ে পা মুড়ে বসল ইবাদত। রেকর্ড থেকে বেগম আখতার তখন গাইছেন :

জিসৎ সে তঙ্গ হো
অ্যায় দাগ তো জিতে কিঁউ হো
জান পেয়ারি ভি নেহিঁ
জান সে যাতে ভি নেহি।।

শুনতে শুনতে বিড়বিড় শুরু হল ইবাদতের—জীবনটা যখন এতই দুর্বিষহ তাহলে বেঁচে আছিস কেন কবি? প্রাণের প্রতি টান নেই অথচ মরণও হয় না তোর। রেকর্ডটা থামতে হুইস্কির গেলাসটা শেষ করে ফেলল ইবাদত। তারপর আরেকটা ঢালল, আর নিমেষে শেষ করে দিল। তার পর আবার। সেটা শেষ হতে জন্নতের নম্বর চাইল বোম্বাই টেলিফোন অপারেটরের কাছে—সেন্ট্রাল ফাইভ নাইন সিক্স সেভেন, প্লিজ।

লাইন লাগতে ওপার থেকে সেই নম্র গম্ভীর স্বর—হ্যালো?

ইবাদত জড়ানো গলায় বলল, ইবাদত বলছি।

ওপার থেকে খুবই সংযত স্বরে—বলো।

বলার কিছু নেই, তোমার আওয়াজ শুনব বলে...

শোনা হল তো... রাখলাম।

জন্নত ফোন নামিয়ে রেখেছিল।

জন্নত ফোন নামিয়ে রাখল। প্রথমে কিছুক্ষণ কথাটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না ইবাদত। কান থেকে রিসিভার নামাতেও পারছে না। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর রিসিভার আপনা থেকে হাত থেকে খসে পড়ে গেল কার্পেটে।

ইবাদত সেটা তুলে জায়গায় রাখলও না। বরং উঠে গিয়ে আলমারির ভেতরের লকার খুলে দীর্ঘদিনের সঙ্গী পিস্তলটা বার করল। তারপর নিজের কপালের দিকে সেটাকে তাক করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাচ্চা, বহুদিন এই মিঞাকে তুই বাঁচিয়েছিস দুশমনদের হাত থেকে। আজ ভালোবাসার লোকদের হাত থেকে বাঁচা!

ইবাদত পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিয়ে দড়াম করে কার্পেটে পড়ে গেল। টোটাহীন পিস্তলে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হয়েছিল শুধু। বড়ো আওয়াজটা হল জোয়ান মরদের দেহটা হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল যখন।

আওয়াজ শুনে নীচের থেকে দুড়দাড় করে ছুটে এসেছিল বাবুর্চি সেলিম। আর উস্তাদকে পড়ে থাকতে দেখে ওর শোর মচানোয় উপরে উঠে এসেছিলেন বেগম অঞ্জুমান। ছেলেকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে বুকে হাত চেপে একটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন অজুমান আরা। তারপরই সেলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, জিন্দা হ্যায় তো?

সেলিম মনিবকে মাটি থেকে তুলতে তুলতে মাথা নেড়ে বোঝাল, হ্যাঁ।

অঞ্জুমান আরা তখন ছুটে গিয়ে ছেলের আঙুলে ফাঁসা পিস্তলটা বার করে জানালার বাইরে ছুড়ে ফেললেন। তারপর ছেলের মাথাটা কোলে নিয়ে কার্পেটে বসলেন মিকেলাঞ্জেলোর পিয়েতা মূর্তির মতো। আর নীরবে চেয়ে রইলেন সেতারের নবীন যিশুর মুখটার দিকে।

অঞ্জুমান আরার মনে পড়ল মৃত্যুশয্যায় স্বামীর কথাগুলো—মিঞার দিকে নজর রেখো, অঞ্জু। ও হমসে ভি বহত, বহত বড়া নিকলেগা। ও হমারে ঘরানেকা তানসেন হ্যায়। উসকো সমহালকে রখনা, অঞ্জু।

বেগমের মনে পড়ল অভাবের সেই দিনগুলো। দুটো ফুলকা আর একটা সবজি খেয়ে রাতের রেওয়াজে বসে ঘুমে ঢলে পড়েছে ইবাদত। টেবিল ফ্যানের তার দিয়ে শক খাইয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন অঞ্জুমান। মা!' বলে চিৎকার করে উঠেছিল ছেলে। মা বললেন, বহত লায়েক বন গয়ে হো, না? সামনে পড়ে হুয়ে বন্দির্শে কৌন উঠায়গা? চলো, সিতার উঠাও!

অঞ্জুমানের মনে পড়ল সেইসব সন্ধ্যে আর রাত যখন পাঁচ বছরের ইবাদতকে কোলে নিয়ে লোরি শোনাচ্ছেন আর গায়ে শাল জড়িয়ে স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছেন মেহরুন বাইয়ের কোঠার দিকে। তখন বুকের ভেতরটা হু হু করছে ব্যথায়, আর তারই মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বর্গের শান্তি। মনে মনে শুধু আওড়াচ্ছেন, আমার আশিককে তুমি কেড়ে নিয়েছ মেহরুন, তো ঠিক আছে। আমার জীবনের নুর, আলো তো এই বুকেই ধরা আছে। ইবাদতের কপালে একটু চুমু দিলেন মা।

অচেতন ছেলের কপালে একটা চুমু দিলেন বেগম অঞ্জুমান আরা। আর মুখ তুলতেই চোখে পড়ল বিছানার পাশে সাইড টেবিলে রাখা স্বামী ইজাজত হুসেন খাঁর ছবিটা। যে-ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রেওয়াজ করে ইবাদত আর কখনো কখনো আপন মনে বলে— ঠিক লগ রহা, অব্বা? কখনো—মঞ্জিল ঠিক হ্যায়, হুজুর? কখনো একটু ঠাট্টার ছলে, কুছ তো বোলিয়ে, উস্তাদ! ছেলে জানেও না মা আড়াল থেকে সব দেখেন, সব শোনেন।

ভোর রাতে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে নিজের ঘরে নেমে এসেছিলেন বেগম অঞ্জুমান আরা। তারপর ভোর হতেই ড্রাইভার উমেদ আলিকে বললেন, গাড়ি নিকালো।

সেলিমকে ডেকে বললেন, সাবকা নাস্তা লগাও। আর ইবাদতকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, মিঞা, কাল বহত পিয়ে হো তুমনে, মুঝে আচ্ছা নহি লগা। অব নহাকে রেডি হো যাও, মুঝে কাম হ্যায় তুমসে। অউর এক বাত আখরি দম তক ইয়াদ রাখনা—পিস্তল খুদকো মারনে কে লিয়ে পয়দা নেহি হুই।

পিস্তল! আকাশ-পাতাল ভাবনা শুরু হয়েছিল ইবাদতের তখনও হ্যাংওভারে আচ্ছন্ন মগজে। আম্মা সাতসকালে হঠাৎ পিস্তলের গপ্পো জুড়লেন কেন!

বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা কাল রাতের ছুড়ে ফেলা পিস্তলটা টেবিলে রাখতে রাখতে শেষ কথাটাও শুনিয়ে গেলেন আম্মা—এরপর নিজের গায়ে তাক করার আগে আমার মাথাতেই দেগে দিও। তোমার আব্বার কাছে অনেক কিছুই পেয়েছি, এখন তোমার কাছে এটাই আমার পাওয়ার আছে।

গাড়িতে উঠে আম্মা উমেদ আলিকে নিশানা বলেছিলেন, মেরিন ড্রাইভ। কাল রাতের কারণে লজ্জায় জড়োসড়ো ইবাদত জিজ্ঞেস করতেও পারেনি—মেরিন ড্রাইভে কোথায়?

মা, ছেলে কারও মুখে কোনো কথা কথা নেই। থেকে থেকেই একটা লজ্জার হাওয়া উঠছে ছেলের মনে। সে আড়চোখে মাঝচল্লিশের মায়ের মুখটার দিকে তাকাল—আহা, কী ভীষণ সুন্দরী আম্মা আমার! অথচ কী দুঃখী মুখ! কতদিন ওই মুখে কোনো স্নেহের আদর পড়েনি! কতদিন ছেলে কোলে শুয়ে ও

মুখ ধরে আদর করে বলেনি—আব্বা সে ভি ম্যাঁয় তুঝসে জেয়াদা প্যার করতা হুঁ, মা!

একটা ঘোরের মধ্যে ছিল ইবাদত। সেটা ভাঙল গাড়িটা মেরিন ড্রাইভের ঠিকানায় থামতে। চটকা ভাঙতে ইবাদত দেখল বাড়িটা জন্নতদের। ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আম্মা!

আম্মা কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন গাড়ি থেকে; অগত্যা পিছন পিছন যেতে হল ছেলেকেও। আম্মা দরজায় বেল দিতে ভেতর থেকে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল জন্নত!

বিস্ময়ে হতবাক জন্নতও—আন্টি, আপ! বিস্ময়ের ভেতরে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পুলকও। মাকে নিয়ে ইবাদত তাহলে শাদির কথা পাকা করতে এসেছে। কিছুদিন উখড়া উখড়া থেকে চাপটা তাহলে ভালোই তৈরি করা গেছে। এখন বাকিটা ভালোয় ভালোয় হলে বাঁচোয়া!

জন্নতের মনের কোণে ইবাদতের সেতার বাজতে শুরু করেছে।

অঞ্জুমান বেগম চুপ আছেন দেখে জন্নত ফের বলল, আইয়ে আন্টি!

নীচের হলঘরে পৌঁছে জন্নতকে আম্মা বললেন, বেটি, তোমার মাকে ডেকে দাও।

জন্নত বলল, আপনারা বসুন, আন্টি। আমি মাকে ডেকে আনছি।

অঞ্জুমান আরা বললেন, আজ আমি বসতে আসিনি, বেটি। তুই মাকে ডেকে দে।

চারদিকে মস্ত মস্ত সোফা বিছোনো, কিন্তু অঞ্জুমান আরা বসলেন না। কাজেই দাঁড়িয়ে থাকল ইবাদতও!

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওঁদের দাঁড়ানো দেখে চমকে গিয়েছিলেন মেহরুন বাই। সিঁড়ির ডগা থেকেই বলতে বলতে নামলেন, সে কী আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বেগম সাহেবান! কী সৌভাগ্য যে আজ আপনার পায়ের ধুলি পড়ল এ-বাড়িতে! ওরে জন্নত, একটু নাস্তাপানির বন্দোবস্ত করতে বল।

অঞ্জুমান আরা কিন্তু সেই দাঁড়িয়েই রইলেন। বললেন, আজ আমার কিন্তু বসা হবে না, বহেন। তোমার থেকে শুধু একটা কথা জানার জন্য এসেছি।

সোফাগুলোর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন মেহরুন বাই। ওর পিছনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশী জন্নত। অঞ্জুমান বেগম একবার খুব নজর করে নিজের ছেলেকে দেখলেন, তারপর মেহরুন বাইয়ের মেয়েকে। তারপর খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, মেহরুন, একবারের জন্য আমার ছেলেকে বলে দাও, জন্নত ওর কী হয়?

এক শিশমহলে যেন কোত্থেকে এক পাথর এসে পড়েছে! চমকে উঠে ইবাদত ও জন্নত একে অন্যের দিকে চাইল। কেউ জানে না এরপর উত্তরে কী শুনতে হবে।

মেহরুন মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। অঞ্জুমান বেগম ফের বললেন, বহেন, আমার ছেলেকে এইটুকু শুধু বলে দাও—জন্নতের আব্বা আর ওর আব্বা একই কিনা।

মেহরুন তখনও নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে, অঞ্জুমান বেগম ইবাদতকে বললেন, বেটা, একবার নিজের মুখটা দেখো আর জন্নতের দিকে তাকাও। তোমার চোখ, তোমার নাক, ঠোঁট, কপাল সব মেলাও ওর সঙ্গে। কার ছাপ দেখছ, মিঞা?

এবার মাটির থেকে মুখ তুলে মেহরুন বাই বললেন, হাঁ, ইয়ে সচ। জন্নতের বাবা আর ইবাদতের বাবা এক। জন্নত আমার আর উস্তাদ ইজাজত হুসেন খানসাহাবের ভালোবাসার ফসল।

অনেক চেষ্টা করেও আর জন্নতের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারল না ইবাদত। আম্মা হেঁটে বেরিয়ে যেতে একবারটি জন্নতের দিকে চোখ ফেলতে দেখল অনামিকার থেকে ইবাদতের দেওয়া সিতারের মেজরাবটা খুলে ওর হাতে তুলে দিচ্ছে জন্নত। হিরের আংটি পরাতে গিয়েছিল প্রেমিকাকে যেদিন ইবাদত, জন্নত আংটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমার মেজরাবটাই আমাকে পরিয়ে দাও, জনাব। যে মেজরাবে সেতারে সুর তোলো তাতেই তো আমিও বাজি। শুনতে পাও না! ফেরার পথে সমুদ্রের পাড়ে বহুক্ষণ বসেছিলেন মা ও ছেলে। একটা কথাও বলেনি কেউ, শুধু উঠে আসার সময় মা বললেন, বেটা, জানি তোমাকে ফের একলা করে দিলাম। কিন্তু এও জেনো যে, আমার চেয়ে একলা কেউ নেই দুনিয়াতে। তোমার তবু সেতার আছে, আমার ছিল বলতে তুমি...

'মাইজি!' বলে ডেকে উঠেছিল ইবাদত। এরকম বলবেন না, মাইজি! আমি তো আপনারই আছি। সিতার তো বাপ-দাদার জিনিস। জন্নত তো কত কাছের ছিল, আর এখন কত দূরের! আমার বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে।

বাতাসের তোড়ে ইবাদতের সব কথা যেন কোথায় উড়ে গেল। বাড়ি ফেরার পথে মা ও ছেলে আবার কীরকম নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ একসময়

বহুকাল পর গান গেয়ে উঠলেন বেগম অঞ্জুমান আরা দাদা জহিরুদ্দিন খানের তালিমে শেখা মির্জা গালিবের লেখা গজল–

ইবনে মরিয়ম হুয়া করে কোই।
মেরে দুখ কি দয়া করে কোই।।

কথাগুলো কানে যেতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি ছড়াল সারা দেহে ইবাদতের। এ কী কথা গাইছেন মা! এ কি মার মনেরও কথা? মা কেন গাইছেন?

যদি মরিয়মের মতো কন্যা হয়ে আমার দুঃখে প্রলেপ দেয় কেউ। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে আম্মার হাতে হাত রাখল ইবাদত। তারপর আম্মার গান শেষ হতে নরম সুরে বলল, আম্মা, অনেকদিন পর ফের দরবারি বাজানোর মন করছে। আপনি শুনবেন?

৩.

সুমন্ত প্রায় নিঃশ্বাস চেপে বসে আছে সম্পাদকের টেবিলের সামনে। সম্পাদক অরিন্দম বসু একটা করে স্লিপ শেষ করে একেবারে গুম মেরে বসলেন।

প্রথমে পাইপ ধরালেন, তাতে গোটা কয়েক সুখটান দিয়ে মুখে একটা আওয়াজ করলেন, হুম।

ভয়ে ভয়ে সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, কী মনে হল, অরিন্দমদা?

সম্পাদক বললেন, তুমি কি চাও এই লেখাটা ছেপে আমি আর তুমি গারদে গিয়ে বসি?

-কেন বলছেন এটা?

-কেন? কারণ উস্তাদ ইবাদত হুসেন খান ইজ নো মোর। এ কাহিনি যে ওঁর মুখে শোনা তার কোনো প্রমাণ আছে? এনি টেপ? এনি সার্টিফিকেট? এনি ড্যাম প্রুফ?।

সুমন্ত ধরা ধরা গলায় বলল, না, অরিন্দমদা। কিন্তু এটা তো আমি ফিকশন করেই লিখেছি। ফিকশন!-বেদম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অরিন্দম বসু। একটা অলটাইম গ্রেট মিউজিশিয়ান আর একটা অল টাইম গ্রেট ফিলম হিরোইনের নাম দিয়ে লিখছ আর বলছ ফিকশন!

সুমন্ত বেকুব বনে গিয়ে একটা খড়কুটো ধরার চেষ্টা করল—কিন্তু ওঁদের কেউই তো আর জীবিত নেই।

আরে বাবা, সেটাই তো সমস্যা—এবার ধৈর্য হারাতে বসেছেন সম্পাদক। ওঁদের কেউ নেই তো কী! ওঁদের নামজাদা ছেলেপুলেরা তো আছেন। আর তা ছাড়া জন্নত নামটা তুমি পেলে কোথায়? উনি বলেছিলেন কি?

তোতলামি শুরু হয়ে গিয়েছিল সুমন্তর-নননন-না!

না! আর তুমি সেই নামটা লাগালে? জানতে পারি কেন?

আমম-মমার কেন জানি না মনে হল?

কেন মনে হল? তুমি কি মাইণ্ড রিড করো?

কারণ উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে করেই হোক ওই নামটা আমায় পৌঁছে দেবেন।

আবার চেপে ধরলেন সুমন্তকে অরিন্দম বসু—দিয়েছিলেন কি?

সুমন্ত আমতা আমতা করে বলল, চেয়েছিলেন, পারেননি। কাগজে পড়েননি উনি মৃত্যুর সময় একটা চিরকুটে একটাই নাম লিখেছিলেন?—জন্নত।

সেটা কি তোমার জন্য?

হলে স্যর কাগজটা শেষ অবধি আমার হাতেই এসে পৌঁছোল কেন? সুমন্ত আস্তে করে বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা চিরকুটটা বার করে সম্পাদকের টেবিলে রাখল। তাতে ভীষণ কাঁপা কাঁপা করে উর্দুতে কী একটা লেখা। চিফ সাব সৈয়দদাকে দেখিয়ে নিয়েছিল সুমন্ত। উনি পড়ে বলেছেন, ওতে লেখা আছে 'জন্নত।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, এটা তোমার কাছে এল কী করে?

সুমন্ত বলল, ফোটোগ্রাফার বিপুল এয়ারপোর্টে ছবি তুলতে গিয়ে খাঁ সাহেবের বডির থেকে এটা ঝরে পড়তে দেখে। তারপর তুলে নিয়ে কাউকে দেবার মতো পায়নি। তখন ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে বডি কোন বাড়িতে আগে যাবে। রবীন্দ্র সদনে আমায় দিয়ে বলল, দ্যাখ, তোর কাজে লাগে কি না। খাঁ সাহেবের বডির থেকে পেলাম।

চিরকুটটা কিছুক্ষণ এক মনে দেখলেন অরিন্দম। সেটা ফেরত দিতে দিতে বললেন, এটা একটা সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দাও।

অ্যাবাউট দ্য স্টোরি আই ক্যান ওনলি সে আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। আমার প্রাণের মায়া আছে, ডিয়ার।

সন্ধ্যেবেলা উস্তাদ ইবাদত হুসেন খাঁর তিলক কামোদ এল পি-টা চালিয়ে প্রায়ান্ধকার ঘরে চুপ করে বসেছিল সুমন্ত। মনে পড়ছিল খাঁ সাহেবের সেই কথাটা—আমি নিউজ পেপারের হেডলাইনে থাকতে চাই না। আমি ইতিহাসে থাকতে চাই, বাবুসাহেব। ঠিক যেরকম এক ছন্দে, ধীরে ধীরে ওর সাক্ষাৎকারটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন খাঁ সাহেব প্রায় সেইভাবেই একটু একটু করে ওর গল্পটা ছিঁড়ে ফেলল সুমন্ত।

তখন কি ওরও চোখে একটু জল ছিল না!